চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব

ডক্টর রাধাগোপাল গোস্বামী

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের উদ্দেশে

ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ অর্পিত হইল।

সেবকাধম—

শ্রীননীগোপাল

পরিচিতি

ডক্টর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, এম-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয়ের 'চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বইখানি সাধারণ ও অসাধারণ দুই রকমের পাঠকেরই উপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে তাঁহার প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ শাস্ত্রানুশাসনে পুটকিত হইয়াছিল ধীরে ধীরে। এই শাস্ত্রানুশাসন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে বাংলাদেশের বাহিরে উন্নত ও ধনী সমাজে প্রসারিত হইতে সহায়তা করিয়াছিল। খাস বাংলাদেশেও তাহার প্রভাব কম পড়ে নাই। তবে এখানে যশোদা-নন্দন কৃষ্ণের পসার বেশি থাকায় দৈবকীনন্দন কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-দীপ্তি ভক্তজনের চক্ষু ধাঁধাইতে পারে নাই। তাই বাংলাদেশে রাধা-কৃষ্ণের পূজা স্বীকৃত হইলেও রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া প্রকৃতি বলিয়াই গৃহীত হইয়াছেন এবং বাঙালী বৈষ্ণবের ভক্তি ও যুক্তির দৃঢ়তায় তাহা ব্রজমণ্ডলেও স্বীকৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাধনার মূল সুর বরাবরই ভক্তির এবং সে সাধনা বন্দনা-আশ্রিত।

ননীগোপালবাবু এমন সাধকদের ও তাঁহাদের সাধনার পরিচয় দিয়াছেন। বইটি ভক্ত পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে বলিয়াই আমার ধারণা।

ব্লক ২ ফ্ল্যাট ৩২
১০, রাজা রাজকিশান স্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

শ্রীসুকুমার সেন

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যের জীবন মাধুর্য বাঙ্‌লার প্রাণধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কাজেই বাঙালীর সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যকে বাদ দিয়া চলে না। এই গ্রন্থে চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরকালে যে বৃহৎ বৈষ্ণব সমাজ এবং সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে, তাহা সমগ্র দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করিয়া এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ এই ইতিবৃত্ত মোটামুটি বাঙালীর সমাজ-সংস্কৃতিরই ইতিহাস। শাক্ত এবং বৈষ্ণব পাশাপাশি বাদ করিলেও বাঙালীর এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বৈষ্ণব-ভাবধারাতেই অনুপ্রাণিত। কাজেই বাঙ্‌লার শিক্ষা-সংস্কৃতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দান উপেক্ষা করা যায় না।

এই ইতিবৃত্তের কাল-সীমা বিস্তৃত হইবে সাধারণতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। তবে আলোচনা-প্রসঙ্গে এই সীমারেখার পূর্বাপরের দুই-এক কথাও সন্নিবেশিত হইতে পারে। বৈষ্ণব-ধর্মের পরবর্তী সময়ে বহু উপ-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিলেও সকলের প্রাণ-রসের উৎস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে নিহিত। কালক্রমে নানা প্রবাহের ধারা আসিয়া উহাতে মিলিত হইয়াছে। এ যেন একই রসের বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ। এই জন্য তাঁহাদের কথাও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তক রচনায় যে সব গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে অথবা প্রয়োজনবোধে রচনায় তাহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের একটি তালিকাও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইল।

গ্রন্থ মধ্যে (পৃঃ ১৭০) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ত্রিপুরাসুন্দরীর সম্বন্ধ আছে বলিয়াছি। ইহা হইতে কেহ এই ধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিকতার সম্বন্ধ আছে বলিয়া যাহাতে মনে না করেন, সে-জন্য বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

ত্রিপুরাসুন্দরীকে শুধু তান্ত্রিক দেবতা বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, নিজেদের বিবেচনায় তাঁহারা হয়তো ভ্রান্ত নহেন। কিন্তু ইহাতে ত্রিপুরাসুন্দরীর মাহাত্ম্য অনেকাংশেই খর্ব করা হয়। বস্তুতঃ 'ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষদ' এই দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে—

ত্রিপুরাতাপিনীবিদ্যাবেদ্যচিচ্ছক্তিবিগ্রহম্ ।
বস্তুতশ্চিন্মাত্ররূপং পরং তত্ত্বং ভজাম্যহম্ ।।

অর্থাৎ ত্রিপুরাতাপিনী বিদ্যাদ্বারা জ্ঞাতব্য চিৎশক্তিময়, প্রকৃতপক্ষে চিন্মাত্ররূপ পরতত্ত্বকে নমস্কার করি।

তন্ত্র ব্যতীত ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষৎ শ্রুতিসিদ্ধ গ্রন্থ। শংকর সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী, ললিতা প্রভৃতি নামে এই দেবীর উপাসনার বহুল প্রচারিত আছে। শংকর-সম্প্রদায়ের প্রতি মঠেই 'শ্রী'যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাঁহারা নিত্য তাঁহাদের প্রথানুসারে অর্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, গোপীরা দেবী কাত্যায়নীর নিকট সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপ সুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

আচার্য সুকুমার সেনের নির্দেশানুসারে এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। বস্তুতঃ তাঁহার স্নেহ ও শুভেচ্ছা আমার জীবনের পরম ঐশ্বর্য। তিনি তাঁহার মূল্য সময় নষ্ট করিয়া এই গ্রন্থের একটি পরিচিতিও লিখিয়া দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আচার্য জনার্দন চক্রবর্তী, ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী প্রমুখ সুধীজনের উপদেশ এই গ্রন্থরচনায় আমাকে পথের নির্দেশ দিয়াছে। প্রখ্যাত সংগীতাচার্য রাজ্যেশ্বর মিত্র (শার্ঙ্গদেব) প্রাচীন বাঙলার সংগীত-শিল্প তথা বঙ্গ-সংস্কৃতির অমূল্যসম্পদ কীর্তন গান সম্বন্ধে আমাকে অনেক উপদেশ দান করিয়াছেন।

কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা তাঁহাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই।

পশ্চিম-বঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগার হইতে আমি বিশেষভাবে উপকৃত। এই গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী শ্রীনিরঞ্জনবিকাশ দে'র অকৃত্রিম ভ্রাতৃসুলভ আচরণ আমার এই গবেষণা কার্যের যথার্থ সহায়ক। এতদ্ব্যতীত সর্বশ্রী কমলা মিত্র, সুবিমল রায়, সুনীল সেন, গৌরহরি সাহু, কালিদাস দে, নগেন্দ্রলাল সাহা প্রমুখ কর্মিগণ অবাধে তাঁহাদের গ্রন্থাদি দেখিতে দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমিয়ভূষণ রায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের গ্রন্থাগারে আমাকে পড়িবার সুযোগ করিয়া দিয়া আমার যে পরম উপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য ইঁহাদের নিকট আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

গ্রন্থখানির শেষে শব্দ-সূচী করিয়া দিয়াছে হাওড়া নেতাজী বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক শ্রীমান্ সত্যকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের কৃপায় তাহার সর্ববিধ কল্যাণ সাধিত হউক।

গ্রন্থখানির মুদ্রণ যথাসম্ভব নির্ভুল করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কয়েকটি গুরুতর ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পৃঃ ৫, পঙ্‌ক্তি ৩, 'হের' স্থলে 'হেন' হইবে, পৃঃ ৬৮—'হরিনাথ চক্রবর্ত্তী' স্থলে 'হরিনাথ গাঙ্গুলী' হইবে পৃঃ ৮০, পঙ্‌ক্তি ১৫, 'গোলক' স্থলে 'গোলোক' হইবে, পৃঃ ৮১, পঙ্‌ক্তি ৫, 'তুয়াবশ স্থলে 'তুয়া যশ' হইবে, পৃঃ ১২২, পঙ্‌ক্তি ১৪, 'ভাগীরথী তাহার' স্থলে 'ভাগীরথী তীরস্থ' হইবে, পৃঃ ১৬৩, পঙ্‌ক্তি ৴৪, 'সপ্তদশ শতকের দিকে' স্থলে 'ষোড়শ শতকের প্রায় মাঝামাঝির দিকে', পৃঃ ১৯৫—শেষের তিন পঙ্‌ক্তির পূর্বে 'যাহারা নামাপরাধ করে তাহারাই নামাপরাধী'—ইহার পুর্বে 'হেডিং' হইবে 'নামাপরাধী' এবং পৃঃ ১৯৬ যেখানে 'নামাপরাধী' 'হেডিং' আছে, তাহা কাটা যাইবে। পৃঃ ২১০, পঙ্‌ক্তি ১১, 'এই সব কার্যাবলীর দরুন…কাটিয়া গেল স্থলে 'অবশ্য ইহা পুরীধামের মাহাত্ম্য। 'উৎকলখণ্ডে' ইহার প্রমাণ আছে। সেই জন্যই পুরীতে…' হইবে, পৃঃ ঐ, পঙ্‌ক্তি ১৬—'এই ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের ·· ঠাঁই পাইতে লাগিল' স্থলে 'ভগবানে যে আত্মসমর্পণ করিল তাহার নিজের বলিতে আর র'হল কি? জাতি, পদ, সমস্তই শুষ্ক পত্রের মতো তাহার জীবন-হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল' হইবে, পৃঃ ঐ, পঙ্‌ক্তি ১৯, 'প্রবল…মধ্যে' স্থলে আদর্শ মলিনতা প্রাপ্ত হইলে বৈষ্ণব ধর্মের কৃপায়…' হইবে। এই জাতীয় আরও কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকবৃন্দের চোখে পড়িলে তাহার জন্য মার্জনা চাহিতেছি।

অনেকদিন হইতে আমি বৈষ্ণব-সাহিত্যবিষয়ক নানাবিধ তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত আছি। ইতঃপূর্বে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'প্রাচ্য-বাণী' হইতে আমার রচিত "বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ" প্রকাশিত হয়। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ইহার একটু 'পরিচায়িকা' লিখিয়া দেন। সে-সময়ে তিনি এবং ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে গবেষণা কার্যে ব্রতী হইবার জন্য উৎসাহ ও উপদেশ দেন। নানা রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া নিয়মিত-ভাবে কার্যে অগ্রসর হইতে পারি নাই।

করুণা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের একান্ত আগ্রহ ও আত্মীয়সুলভ সহযোগিতায় এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ ঘটিল। এজন্য ইহার নিকট কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, জগতে দিনের পর দিন যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই শেষ কথা নয়। তাহার অতীত তীরে যাহার প্রকাশ, মানুষের সীমাবদ্ধ ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। বৈষ্ণব কবি ও চরিতকারগণ সাহিত্যের মন্দিরে ভক্ত, দার্শনিক, শিল্পী আর আমার শুধু দিন-মজুরের বৃত্তি। তাঁহারা মহাসমুদ্রের রূপ মানস-মন্দিরে অবলোকন করিয়া পাঠকের সমক্ষে একটি দিব্য-চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। আর আমি? কতকগুলি শুষ্ক তথ্য সংগ্রহ করিয়া বলিতেছি, এই ঘটনার পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ভক্তজনের মনের কোণে যে বৈষ্ণবের ছাপ পড়িয়াছে, তাহা এই ঐতিহাসিক কাহিনী হইতে অধিকতর সত্য, তাহা বর্ণনার ভাষা আমার নাই।

রথযাত্রা
হাওড়া } শ্রীননীগোপাল গোস্বামী

সূচী

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসে বৈষ্ণবসমাজ ও সাহিত্য

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মর্তলীলার পরিসমাপ্তি। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অনুধাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা শ্রীচৈতন্যের আদর্শে প্রবর্তিত। শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশাতেই এই নব-বৈষ্ণবধর্মের সহিত বাঙলার প্রথম পরিচয় হইলেও তাঁহার তিরোভাবের পর সারা বাঙলায় ইহার সম্প্রসারণ এবং বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের দার্শনিক ব্যাখ্যায় তাহার প্রতিষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যের সময় হইতে এই নব-বৈষ্ণবধর্ম গড়িয়া উঠিলেও বাঙলার সহিত বৈষ্ণবধর্মের পরিচয় বহুকালের।

বাঙলার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় গুপ্তযুগ হইতে। এই সময় বিষ্ণুপ্রধান বৈষ্ণবধর্মের এদেশে যে প্রসার হইয়াছিল, তাহার পরিচয় মেলে। তবে গুপ্তরাও বৈষ্ণবধর্ম এদেশে সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। তাঁহাদের আগমনের পূর্বেই দেখা যায়, আনুমানিক ৪র্থ শতাব্দীর শুশুনিয়া পর্বতলিপিতে চন্দ্রবর্মণকে চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে সব পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে সেই সমস্ত কাহিনী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দী হইতে বাঙলাদেশে যে প্রচলিত ছিল পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। আনুমানিক ১১দশ শতকের বেলাব শিলালেখে শ্রীকৃষ্ণকে "গোপীশতকেলিকার" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যদিও উক্ত শিলালেখ অনুসারে কৃষ্ণ অংশাবতার মাত্র।

সেন বংশের আমলে বাঙলায় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ প্রসার হয়। রাজা লক্ষ্মণসেন ছিলেন পরমবৈষ্ণব। তাঁহার সময় হইতে রাজকীয় শাসনের প্রারম্ভে শিবের পরিবর্তে বিষ্ণুর স্তবের প্রচলন হয়।

জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতিধর, শ্রীধর প্রভৃতি লক্ষ্মণসেনের সভাকবিগণ তাঁহাকে স্তুতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তবে সেই শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, তিনি "গোপবধূবীট"। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সম্মানিত ও আদৃত। গীতগোবিন্দে বিষ্ণুর দশ অবতারের যে বর্ণনা আছে, কালে তাহাই সমগ্র ভারতে গৃহীত হইয়াছে।

এইভাবে ধীরে ধীরে বৈষ্ণবধর্ম বাঙলাদেশে প্রসার লাভ করিতেছিল। তবে এই ধর্ম এ পর্যন্ত দার্শনিক ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবার কেহ প্রয়াস পান নাই। আচার্য রামানুজ-প্রচারিত "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" হইতে বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তিতে প্রথম প্রতিষ্ঠা। রামানুজ তাঁহার পূর্ববর্তীকালের প্রসিদ্ধ প্রায় সকল বৈষ্ণব মতই গ্রহণ করিয়া স্বীয় দার্শনিক প্রতিভায় তাহাকে একটি সুস্পষ্ট মতবাদে রূপায়িত করেন। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সমগ্র ভারতে যে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করে, তাহাতে ভারতের ভক্তিবাদের ভিত্তি টলিয়া যায়। শঙ্করের ক্ষুরধার তর্ক-বুদ্ধির সম্মুখে দাঁড়াইতে অনুরূপ বলিষ্ঠ প্রতিভার প্রযোজন ছিল। সেই প্রয়োজনেই রামানুজাচার্যের আবির্ভাব। রামানুজের পর হইতে দার্শনিক বৈষ্ণব মত নানাভাবে ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই সব মতবাদেরই মুখ্য-প্রতিপক্ষ আচার্য শঙ্কর। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের খণ্ডনের উপরেই পরবর্তীকালে মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য-গণের দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা।

মধ্বাচার্য রামানুজের কিছু পরবর্তীকালের লোক। দার্শনিক ভিত্তির উপর তাঁহার মতবাদ স্থাপন করিয়া তিনি দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাক্-চৈতন্য যুগে রামানুজ ও মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের কেহ কেহ বাঙলাদেশে যাতায়াত করিতেন বলিয়া শোনা যায়। অবশ্য তৎকালে বাঙলায় রামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সুস্পষ্ট ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

তাঁহার "শ্রীবৈষ্ণব" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৬) লিখিয়াছেন যে, তাঁহার উর্ধ্বতন দশমপুরুষ হরিচরণ চট্টরাজ রামানুজীয় বৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্যত্র কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাক্-চৈতন্যযুগে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া কথিত মাধবেন্দ্রপুরীর এদেশে প্রেম-ভক্তি-প্রচারের কথা শোনা যায়—"ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।"[১] "বৈষ্ণব-বন্দনায়" দেবকীনন্দনও তাঁহাকে ভক্তি-পথের 'প্রথম অবতার' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর।"[২] আচার্য অদ্বৈত, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

পরবর্তী সময়ে ভারতে আর একজন বৈষ্ণবাচার্যের আবির্ভাব হয়। ইঁহার নাম রামানন্দ স্বামী। রামানন্দ রামানুজ-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেও পরে তিনি এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সংগঠন করেন। এই সম্প্রদায়ের নাম 'রামাইৎ'। রামানন্দের নাম অনুসারে ইহাকে রামানন্দী-সম্প্রদায়ও বলে। শ্রীরামচন্দ্র এই সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা। উত্তরকালে কবীর এই রামানন্দেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণবধর্মের সহিত সাহিত্যও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে[৩] লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ "বৈষ্ণব সর্বস্ব" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের অস্তিত্ব কোথায়ও আছে বলিয়া আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই। তবে লক্ষ্মণসেনের বিশিষ্ট সভাকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের নাম পূর্বেই বলিয়াছি। এই গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যের একটি অপরিচ্ছেদ্য সম্পদ। জয়দেবের পরবর্তী সময়ে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি পদাবলী

১ চৈতন্যভাগবত—আদি খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়—সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত (১৩৬৯), পৃঃ ৬০

২ চৈতন্যচরিতামৃত—আদি লীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ—ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত 'সাহিত্য অকাদেমী'-সংস্করণ (১৯৬৩), পৃঃ ৪১

৩ বাংলাদেশের ইতিহাস—পৃ, ৮৯ ও ১৩১

রচনা করেন এবং বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন"। কৃত্তিবাস বাঙলায় যে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে নারায়ণকেই মূল পুরুষ ধরিয়া তাঁহার চারি অংশ প্রকাশের কথা বলিয়াছেন—

শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ ॥[১]

পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে রচিত (শক ১৪১৫ = খ্রীষ্টাব্দ ১৪৯৩) রামকেলী গ্রামের অধিবাসী কবি চতুর্ভুজ ভট্টাচার্যের "হরিচরিতম্" নামক মহাকাব্যের নাম করা যাইতে পারে। কবি কৃষ্ণ-চরিত অবলম্বনে ত্রয়োদশ সর্গে সংস্কৃতে এই মহাকাব্য রচনা করেন।[২]

শ্রীচৈতন্যের জন্মের অত্যল্পকাল পূর্বে মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" রচনা করেন। প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়। কাজেই বাঙলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

শেখরের 'পদ' হইতে জানা যায় যে, নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই ব্রজরস গাহিয়াছিলেন—

১ কৃত্তিবাসী রামায়ণ—আদিকাণ্ড—পূর্ণচন্দ্র দে সম্পাদিত (১৯২৮) পৃঃ ৩

২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির বিবরণীতে (Report on the Search of Sanskrit Mass 1895-1900, p. 17) এই গ্রন্থের নাম দেখা যায়। পরে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নেপাল হইতে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন, মূল পাণ্ডুলিপি ছিল নেপাল-রাজের পুস্তকাগারে। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য নেপালে গিয়া মূল-পাণ্ডুলিপি-দৃষ্টে এই নকল পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া আনেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁহারই সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ইং ১৯৬৭ সালে এই মহাকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
হের নরহরিসঙ্গ পাঞাপহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ ॥[১]

এইভাবে প্রাক্-চৈতন্যযুগে বাঙালী-মানস সমাজ ও সাহিত্যে কি ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। এই মানস-ধর্ম বাঙালীর জীবনে কি ভাবে ধীরে ধীরে উথলিয়া উঠিয়াছে, পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তাহাই বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "বৈষ্ণব পদাবলী" (সাহিত্য সংসদ-সংস্করণ, ১৯৬১) পৃঃ ৩০৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসেন এবং নীলাম্বর আচার্যের কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপেই বসবাস করিতে থাকেন।

শ্রীচৈতন্যের যখন জন্ম হয়, তখন নবদ্বীপ এবং বাঙলার অন্যান্য স্থানে কৃষ্ণ-ভক্ত লোক কিছু কিছু ছিলেন, যেমন— চন্দ্রশেখর, শ্রীবাস, মুকুন্দ, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, বক্রেশ্বর এবং শ্রীকান্ত, শ্রীপতি ও শ্রীরাম নামে শ্রীবাসের তিন ভাই, জগদীশ, গোপীনাথ, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস, সদাশিব, রত্নগর্ভাচার্য প্রভৃতি। ইহা ছাড়া ছিলেন "শ্রীচৈতন্যের অগ্রদূত" বলিয়া কথিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। তাঁহার বাড়ী ছিল শান্তিপুরে এবং নবদ্বীপেও তিনি থাকিতেন।

মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, লোচন দাস ও জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত লইয়া রচিত হইয়াছে। এই সব গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শচীদেবীর পর পর কয়েকটি সন্তান মারা যায়। ইহার পর এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম বিশ্বরূপ। কিন্তু তিনিও পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। বিশ্বরূপের পরে যে সন্তান জন্মে তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর বা শচীদেবীর আদরের নিমাই। এই নিমাই-ই উত্তরকালে শ্রীচৈতন্য নামে খ্যাত হন।

নিমাই-এর বাল্য-জীবনের কথা বলিতে গিয়া বৃন্দাবন দাস কৃষ্ণের বাল্য-লীলা সবিস্তারে আরোপ করিয়াছেন। বিশ্বরূপ লেখা-পড়া শিখিয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান। এ জন্য জগন্নাথ মিশ্র নিমাই-এর অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার ভয় হয়, লেখাপড়া

শিখিলে নিমাইও বিশ্বরূপের মতো সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। নিমাই বাল্যকালে যে খুব দুরন্ত ছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রায় সব চরিত-লেখকগণই এক মত। তবে দুরন্ত হইলে তাঁহার বুদ্ধিও ছিল প্রখর। একবার অশুচি স্থানে গিয়া দাঁড়াইলে শচীমাতা তিরস্কার করেন। নিমাই উত্তর দেন—

তোরা না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমতে ?
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভালমন্দ স্থান।
সর্বত্র আমার হয়—অদ্বিতীয় জ্ঞান॥[১]

ইহা হইতে নিমাই-এর জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়। পরে জগন্নাথ মিশ্র নিমাই-এর অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং লেখাপড়া শিখিয়া তিনি হন বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

পঠদ্দশাতেই নিমাই-এর পিতৃবিয়োগ হয়। বিশ্বরূপ পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়া ছিলেন। কাজেই সংসারের সকল ভার তাঁহার উপর পড়ে। তিনি বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালনে ব্রতী হন এবং মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

অতঃপর নিমাই পূর্ববঙ্গে গমন করেন। এদিকে সর্প-দংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়। দেশে ফিরিয়া নিমাই পত্নীশোক সহ্য করিয়া মাতাকে প্রবোধ দিলেন এবং পুনরায় অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিলেন। পরে সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়।

ইহার পর নিমাই-এর জীবনের প্রধান ঘটনা পিতৃকৃত্য করিতে গয়া গমন এবং যথারীতি ক্রিয়া সম্পাদনের পর তাঁহার পূর্ব-পরিচিত ঈশ্বরপুরীর নিকট "দশাক্ষর" মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ।

১ চৈতন্তভাগবত, আদিকাণ্ড, ৫ম অধ্যায়—সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত (১৩৬৯), পৃঃ ৪৫-৪৬

গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন ও দীক্ষা গ্রহণের পর নিমাই-এর জীবনের পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি যেন নূতন মানুষ হইয়া দেশে ফিরিলেন। তাঁহার ব্যবহার নম্র হইল এবং পূর্বের চাপল্যও আর রহিল না।

তাঁহার দ্বিতীয় পরিবর্তন—অসাধারণ কৃষ্ণভক্তি। গয়া যাইবার পূর্বে নিমাই বৈষ্ণব দেখিলেই 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করিতেন এবং এমনকি, শ্রীবাসের ন্যায় মাননীয় ব্যক্তিকেও তিনি নানাভাবে বিব্রত করিতেন—

"শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন"।[১]

তাঁহার এই পরিবর্তন দেখিয়া লোকে আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল—

পরম-অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥

নিমাই-এর তৃতীয় পরিবর্তন অধ্যাপনা ত্যাগ এবং চতুর্থ পরিবর্তন গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা।

গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাই মোটামুটি এক বছর গৃহে ছিলেন। এই সময়কার প্রধান ঘটনা অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা, হরিদাস ও নিত্যানন্দের সহিত মিলন এবং সঙ্কীর্তন প্রচার। জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং কাজীদলনও ইহাদের অন্যতম।

অতঃপর নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় গিয়া উপনীত হন। সেখানে কেশব ভারতীর নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সময় সেখানে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য এবং মুকুন্দ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাই-এর নাম হয় "শ্রীচৈতন্য"। সেই হইতে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বা শুধু 'চৈতন্য' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

১ চৈতন্যভাগবত, আদিকাণ্ড, ৭ম অধ্যায়—সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত পৃঃ ৬৮

২ চৈতন্যভাগবত—মধ্য খণ্ড, ১ম অধ্যায়—সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত পৃঃ ১২৭

ইহার পর নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে লইয়া আসেন। সেখানে শচীদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তথা হইতে মায়ের অনুমতি লইয়া তিনি নীলাচলে যাত্রা করেন। চৈতন্যের জীবৎকাল মোটামুটি আটচল্লিশ বৎসর। ইহার মধ্যে প্রায় চব্বিশ বৎসর তিনি গৃহে ছিলেন এবং জীবনের শেষ চব্বিশ বৎসর নীলাচলেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁহার ছয় বৎসর দেশ পর্যটনে কাটিয়াছে।

নীলাচলে উপনীত হইয়া কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। চৈতন্যের সঙ্গে এই স্বল্প সময়ের সাহচর্যলাভে বৈদান্তিক সার্বভৌম পণ্ডিত ও পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের মত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁহারা চৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের মোট সময় মোটামুটি দেড় বছরের কিছু বেশী। এই সময়ে চৈতন্যের জীবনের প্রধান ঘটনা রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়া ধর্মতত্ত্ব আলোচনা। রামানন্দের নিকট হইতে চৈতন্যদেব যে তত্ত্ব লাভ করেন, সেই রাগানুগা ভক্তিই বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা। রামানন্দের সহিত মিলন ব্যতীত অপর দুইটি ঘটনা হইতেছে "ব্রহ্মসংহিতা" ও "কর্ণামৃত" পুথির সহিত পরিচয়।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া চৈতন্যদেব দুই বৎসরকাল নীলাচলে অবস্থান করেন। ইহার পর বৃন্দাবন-যাত্রামানসে নীলাচল ত্যাগ করেন এবং গৌড়দেশের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। পথে রামকেলী গ্রামে গৌড়েশ্বরের দুইজন হিন্দু মন্ত্রী গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইঁহারাই উত্তরকালে রূপ-সনাতন নামে বিখ্যাত হন। কিন্তু বৃন্দাবন যাওয়া আর তাঁহার হয় না, গৌড়দেশ হইতে তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন।

নীলাচলে এক বৎসর অবস্থানের পর পুনরায় তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করেন। এই ভ্রমণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা রূপ ও

সনাতনের সহিত মিলন এবং উভয়কে শিক্ষাদান। প্রয়াগে রূপ তাঁহার অনুজের সহিত আসিয়া শ্রীচৈতন্যের শরণ লইলেন। দশ দিন ধরিয়া চৈতন্যদেব—

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥[১]

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রামানন্দের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য সব তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে রূপ বৃন্দাবনে চলিয়া যান। ইহার পর কাশীধামে সনাতন আসিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হন এবং দুই মাস ধরিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ব্যূহতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেন। সনাতনকে তিনি বলেন—

পূর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তির সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার[২]॥

এই সময়ে চৈতন্যদেবের জীবনের আর একটি প্রধান ঘটনা কাশীধামে বৈদান্তিক প্রকাশানন্দের সহিত বিচারে অদ্বৈত-মত খণ্ডন।

বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য আর কোথায়ও যান নাই। এই সময়ের প্রধান ঘটনা হরিদাস ঠাকুরের তিরোধান, ছোট হরিদাস বর্জন প্রভৃতি।

---

১ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ—ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত "সাহিত্য অকাদেমী"-সংস্করণ (১৯৬৩)—পৃঃ ৩৫০-৩৫১

২ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৩শ পরিচ্ছেদ—ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত "সাহিত্য অকাদেমী"-সংস্করণ (১৯৬৩)—পৃঃ ৩৯০-৩৯১

শ্রীচৈতন্যের এই সময়ের নীলাচল-বাসের কাল দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁহার আদেশে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন কর্তৃক বৈষ্ণব-স্মৃতি ও ভক্তিতত্ত্ব প্রণয়ন আর নিত্যানন্দের গৌড়ে বৈষ্ণবধর্মপ্রচার। প্রথমে শ্রীচৈতন্য এই দুই জায়গার সহিতই যোগাযোগ রাখেন। কিন্তু দিন-দিনই তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং কৃষ্ণ-বিরহে তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। ক্রমে তাঁহার সব কিছুই ভুল হইতে থাকে। দেখা যায়, কখনও বা তিনি যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছেন আবার কখনও বা চটক পর্বতকে গোবর্ধন বলিয়া ভুল করিতেছেন। ইহাতে মনে হয়, নীলাচলে থাকিলেও সব সময়েই তিনি বৃন্দাবনের কথা ভাবিতেছিলেন। এইভাবেই তাঁহার জীবনের পরিসমাপ্তি।

শ্রীচৈতন্য যতদিন বর্তমান ছিলেন, ততদিন বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর নেতৃত্বের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক বছরের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া পরস্পর বিবদমান কতকগুলি উপশাখার উদ্ভব হইল—গৌরাঙ্গনাগরবাদিগণ, অদ্বৈত-সম্প্রদায়, গদাধর-সম্প্রদায় ও নিত্যানন্দ-বিদ্বেষী সম্প্রদায়।[১] নীতিগত কোন বৈষম্য না থাকিলেও নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে যিনি যে ভাবে পারিলেন নেতা হইয়া বসিলেন। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ যখন বিপর্যস্ত, তখন সেখানে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল "গুরুবাদের" প্রবর্তনে। ঘটনা পরম্পরায় বিষয়টি আরও জটিল হইয়া উঠিল। নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর বীরভদ্রের দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলে তিনি অদ্বৈতাচার্যের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের জন্য শান্তিপুরে রওনা হন। এই সময় নর্তক গোপাল, মীনকেতন, রামদাস প্রভৃতি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়া জাহ্নবা

১ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার — শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (১৯৩৯) পৃঃ ১৮৭

দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করান। ফলে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রবল হইয়া উঠে এবং আপন বংশ বা পরিবারের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণের বিধান একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে বাঙলাদেশে দুইটি প্রধান গুরুগোষ্ঠীর পত্তন হইল—একটি শান্তিপুরে, অপরটি খড়দহে।

অদ্বৈতের পর সীতাদেবী ও তাঁহার পুত্রগণ দীক্ষাদান করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের কোনও আড়ম্বর ছিল না। এদিকে জাহ্নবা দেবী ছিলেন বিশেষ তেজস্বিনী মহিলা। নিত্যানন্দের পর তিনিই 'প্রভু' হইয়া বসেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে তিনিই প্রথম মহিলা মহান্ত, যিনি অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া গোস্বামিগণের সমান মর্যাদা লাভ করেন। এই প্রভাবশালিনী জাহ্নবা ঠাকুরাণীকে লক্ষ্য করিয়াই উত্তরকালে "খড়দার মা গোঁসাই"[১] প্রবাদটির উদ্ভব।

জাহ্নবা দেবীর পর তাঁহার স্থান অধিকার করেন বীরভদ্র। তিনিও ছিলেন খুব তেজস্বী পুরুষ এবং কতকটা রাজার মতনই ছিল তাঁহার চালচলন।

শান্তিপুর ও খড়দহের গুরুপাট ছাড়া আরও কিছু কিছু গুরুপরম্পরার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শ্রীখণ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইভাবে বৈষ্ণবসমাজ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তখন তাহার মূল ঐক্যও হারাইল, কেহই আর সর্বজনীন কল্যাণকামনায় আপন স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে আগাইয়া আসিলেন না। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ কতকগুলি গুরুপাটকে কেন্দ্র করিয়া যেন এক একটি ভিন্ন সম্প্রদায়রূপে গড়িয়া উঠিল।

দেশের আভ্যন্তর অবস্থাও তৎকালে খুব ভাল ছিল না। এদেশে অধিকাংশ সময়েই যুদ্ধবিগ্রহ, লুঠতরাজ একরূপ লাগিয়াই

১ ডঃ সুশীলকুমার দে—বাংলা প্রবাদ, পৃঃ ২৬৮, প্রবাদ নং ২১৩৪

ছিল। ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে 'স্মৃতি'র প্রভাব ছিল বেশী। পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে ন্যায়ের চর্চাও খুব বেশী ছিল। তান্ত্রিক প্রভাবও দেশে মন্দ ছিল না।

দেশের এই রকম পরিস্থিতিতে বৃন্দাবন হইতে ষড়-গোস্বামিগণের শেষ গোস্বামী শ্রীজীবের নিকট শিক্ষা সমাপন করিয়া শ্যামানন্দ ও নরোত্তমসহ শ্রীনিবাস আচার্য গৌড়দেশে আগমন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙলায় নবজাগরণ

এপর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কোনও বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে অবশ্য বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শাস্ত্র-রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু সেই সব শাস্ত্রগ্রন্থ এপর্যন্ত বাঙলা-দেশে আসে নাই। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ—শ্রীজীবের পরিকরত্রয় বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময় সেই সব গ্রন্থের অনেকগুলি সঙ্গে করিয়া আনেন এবং অবশিষ্ট গ্রন্থগুলিও পরবর্তী সময়ে এদেশে আসে। ফলে এই সব গ্রন্থের মর্মকথা প্রচারিত হইতে থাকে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ক্রমে একটি স্বতন্ত্র মতবাদরূপে গড়িয়া উঠিবার প্রয়াস পায়। এইখানেই চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নবজাগরণের দিগ্দর্শন। এখন শ্রীজীবের এই পরিকরত্রয়-সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীনিবাস আচার্য

শ্রীনিবাস আচার্যের জীবন-চরিত ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস, অনুরাগবল্লী, বংশী-শিক্ষা, প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, শ্রীনিবাস-চরিত্র, শ্রীনিবাসগুণলেশ সূচক, নব-পদ্য প্রভৃতি পাঠে জানিতে পারা যায়।

পিতা গঙ্গাধর[১] ভট্টাচার্য ছিলেন চৈতন্য-ভক্ত। সেই জন্য তাঁহার নামান্তর 'চৈতন্যদাস।' গঙ্গাধরের নিবাস ছিল ভাগীরথীর পূর্ব-তীরবর্তী চাখন্দীগ্রামে। এই স্থান বর্তমানে ভাগীরথী-গর্ভে বিলুপ্ত।

গঙ্গাধরের বিবাহ হয় বর্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডের নিকটে যাজিগ্রামে বলরাম চক্রবর্তীর কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে।

শ্রীনিবাস বাল্যকালে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। শিক্ষা-দীক্ষাতেও ছিল তাঁহার বিশেষ প্রতিভা। অনুরাগবল্লীতে আছে, তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—

১ ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ (গৌড়ীয় মিশন-সংস্করণ), পৃঃ ৪৭

পৌগণ্ডে আরম্ভে বিদ্যা কথোক দিবসে।
ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কারেতে প্রবেশ ॥[১]

ইহা ছাড়া কোষ এবং তর্কশাস্ত্রও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায়—

অল্পদিনে ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার।
তর্কাদি পড়িল—লোকে হৈল চমৎকার ॥[২]

কিন্তু ইঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আজও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবৈষম্য দূর হয় নাই।

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথের মতে শ্রীনিবাসের জন্মকাল ১৫৭২-৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে[৩]। এই মতের সমর্থনের জন্য তিনি শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎশিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ ও কর্ণপূর কবিরাজের কথা অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং শ্রীনিবাস-তনয়া হেমলতার শিষ্য যত্নুনন্দনের রচিত কর্ণানন্দের উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

রাধামাধব তর্কতীর্থ গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন—"শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মকাল হিসাবে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বা নিকটবর্তী কালের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।"[৪] এজন্য শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের শিষ্য নহেন বলিয়া তাঁহাকে মত স্থাপন করিতে হইযাছে।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খৃঃ) সময় শ্রীনিবাস কিশোরবয়স্ক। ঐ সময় তাঁর বয়স ১৩।১৪ বছরের মত ধরলে ১৫১৯।১৫২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম বলা যেতে পারে।"[৫]

১ ২য় মঞ্জরী, মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত (৩য় সংস্করণ) পৃঃ ৮

২ ২য় তরঙ্গ, গৌড়ীয়মিশন-সংস্করণ (১৯৪০) পৃঃ ৪৯

৩ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা (৪র্থ সংস্করণ) পৃঃ ২৪

৪ Our Heritage, vol II, Part I (Bulletin of the Post-Graduate Training and Research, 1954, Sanskrit College, Calcutta)—পৃঃ ১৯৭-১৯৮ ও ২০১-২০২

৫ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (১ম প্রকাশ ১৯৫৮) পৃঃ ১৮৯

এইসব বিভিন্ন মতের সত্যাসত্য বিচার করিয়া শ্রীনিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা প্রয়োজন।

শ্রীনিবাসের জীবন-কাহিনী যে সব প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে নরহরির 'শ্রীনিবাস চরিত্র'-গ্রন্থখানি এখনও দুষ্প্রাপ্য। শ্রীনিবাসের শিষ্যগণের নাম বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি তাঁহার 'ভক্তি-রত্নাকরে' উল্লেখ করিয়াছেন--

শিষ্যগণ নাম এথা লিখিতে নারিনু।
শ্রীনিবাস-চরিত্র গ্রন্থেথে বিস্তারিনু॥[১]

এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থের সবগুলিই পাওয়া যায়। কাজেই এই সব গ্রন্থের সাহায্যে শ্রীনিবাসের কাল-নির্ণয় করা যায় কিনা দেখিতে হইবে। তবে 'কর্ণানন্দ' 'শ্রীনিবাস-গুণলেশ সূচক' এবং 'নব-পদ্য' ব্যতীত অন্যত্র এ বিষয়ে অবহিত হইবার কোন সূত্র নাই।

প্রথমে কর্ণানন্দ হইতে এ সমস্যার সমাধান হয় কিনা দেখা যাক। অবশ্য কর্ণানন্দে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অস্বাভাবিক কিছু না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কর্ণানন্দের রচয়িতা যদুনন্দন দাস। যদুনন্দন ছিলেন শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য। মুর্শিদাবাদ জিলার সৈদাবাদ শহরের পার্শ্ববর্তী ভাগীরথীর অপর তীরে বুঁধইপাড়া গ্রামে হেমলতা বাস করিতেন। যদুনন্দনও অধিকাংশ সময় হেমলতার কাছেই থাকিতেন। কাজেই শ্রীনিবাসের জীবন-চরিত সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জানিবার সুযোগ ছিল। বিশেষতঃ এই গ্রন্থ শ্রীনিবাস স্ব-ইচ্ছাতেও রচনা করেন নাই। শ্রীনিবাসের কোনও সু-লিখিত জীবনী না

১ গৌড়ীয় মিশনের সংস্করণ (১৯৪০), ১৪শ তরঙ্গ, শ্লোক ১৯৩, পৃঃ ৬৩৯

থাকায় হেমলতা ঠাকুরাণীই এই গ্রন্থ প্রণয়নে যদুনন্দনকে আদেশ করেন—

প্রভু আজ্ঞাবাণী আর বৈষ্ণব আদেশ।
মনোমধ্যে ইহা আমি বুঝিনু বিশেষ॥

—কর্ণানন্দ, ১ম নির্যাস[১]

রচনা শেষ হইলে যদুনন্দন তাহা হেমলতা ঠাকুরাণীকে পড়িয়া শোনান। গ্রন্থ-শ্রবণে হেমলতা আনন্দলাভ করেন এবং নিজেই ইহার নাম রাখেন—'কর্ণানন্দ'। গ্রন্থকারের নিজের উক্তিতেই ইহা প্রকাশ—

বুঁধইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
তার দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিল নাম গ্রন্থ 'কর্ণানন্দ'॥

—কর্ণানন্দ, ৬ষ্ঠ নির্যাস[২]

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, কর্ণানন্দের রচনা সমাপ্ত হয় ১৫২৯ শকে (= ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ) বৈশাখী পূর্ণিমায়। তখন শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্রগণও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন বলিয়া কর্ণানন্দের বর্ণনা হইতে জানা যায়—

শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥

---

১ বহরমপুর সং (বঙ্গাব্দ ১২৯৮), পৃঃ ৫
২ ঐ পৃঃ ১১৯

শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর।
তিন পুত্র শিষ্য তাঁর তিন ভক্ত শূর ॥

—কর্ণানন্দ, ১য় নির্যাস[1]

এই গতিপ্রভু অর্থাৎ গতি গোবিন্দ (নামান্তর গোবিন্দ গতি) হইতেছেন শ্রীনিবাসের সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্র—'সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দ গতি নাম' (অনুরাগবল্লী, ৭ম মঞ্জরী)। এই গতি গোবিন্দের কৃষ্ণপ্রসাদ, সুন্দরানন্দ, শ্রীহরি নামে পুত্রত্রয় যখন তাঁহাদের পিতৃদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারাও যে বেশ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথের মতে ১৫৭২-৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীনিবাসের জন্মকাল ধরিলে 'কর্ণানন্দ' রচনার সময় তাঁহার বয়স হয় (১৬০৭ খ্রীঃ—১৫৭২।৭৬ খ্রীঃ) ৩১ হইতে ৩৫ বছরের মধ্যে। এই বয়সের লোকের পৌত্রগণ যে সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা সম্ভবপর নহে। কাজেই ডক্টর নাথের মত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

রাধামাধব তর্কতীর্থের মতও ঠিক ঐ একই কারণে গ্রহণ-যোগ্য নহে।

'ভক্তিরত্নাকর' পাঠে জানা যায় যে, শ্রীনিবাস যখন নীলাচলে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার "কিশোর বয়স"। "কিশোর বয়স" বলিলে বুঝিতে হয় ১১ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক (চলন্তিকা)। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, ১১ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে কোন্ বয়সে শ্রীনিবাস নীলাচলে যান? 'অনুরাগবল্লী'র পাঠ উদ্ধার করিয়া পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, শ্রীনিবাসের পৌগণ্ডে (৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে) বিদ্যারম্ভ হয়। শ্রীনিবাস যদি পাঁচ বৎসর বয়সেই বিদ্যারম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, কোষ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে অন্ততঃ তাঁহার ৮।১০ বছর

১ বহরমপুর সং (বঙ্গাব্দ ১২৯৮), পৃঃ ২৮

লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, চাখন্দীর বাস তুলিয়া দিয়া তাঁহারা যাজিগ্রামে চলিয়া আসিয়াছেন। কাজেই সাংসারিক প্রয়োজনেও যে, তাঁহার কিছু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা বলা যাইতে পারে। এই সব কাজ-কর্ম খুব কম করিয়াও একটা লোক বছর দশেকের কমে শেষ করিতে পারে না। কাজেই ৫ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ হইলে যদি সব কাজ শেষ করিতে তাহার ১০ বছর লাগে, তাহা হইলে বয়স হয় ১২ বৎসর। সুতরাং ১৫ বৎসর বয়সের পূর্বে তিনি নীলাচলে যাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 'অনুরাগবল্লী'তে দেখা যায় (দ্বিতীয় মঞ্জরী) যে, মহাপ্রভুর নিকট ভাগবত পড়িবার জন্য শ্রীনিবাস পুরী যাত্রা করেন। এদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, অন্ততঃ ১৫ বছর বয়সের কমে কোন লোকের ভাগবত পড়িবার ইচ্ছা হওয়া সম্ভবপর নহে। কাজেই শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ১৫১৯/১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের জন্ম হইতে পারে না। বিশেষতঃ ১২ বছরের কমে তো দূরের কথা, ১৫ বছর বয়সের লোকের পক্ষেও সেকালে একাকী হাঁটা-পথে কোন দূরদেশে যাওয়া একরূপ অসম্ভবই ছিল। অবশ্য নরহরি সরকার ঠাকুর স্নেহপরবশ হইয়া শ্রীনিবাসের নীলাচল-যাত্রার জন্য 'পথের সঙ্গতি' করিয়া দেন—

> পথের সঙ্গতি করি দিল সেই ক্ষণে।
> ঠাকুরের যে-স্নেহ বর্ণিবে কোন্ জনে?
>
> — ভক্তিরত্নাকর, ৩য় তরঙ্গ[১]

কাজেই ১৫ বছরের বালক শ্রীনিবাসের পক্ষে একাকী নীলাচল যাইতে কোন অসুবিধা দেখা দেয় নাই।

এখন শ্রীনিবাস কোন্ বছরে নীলাচলে গেলেন, তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলেই তাঁহার আবির্ভাব কাল নির্ণয়ও সহজ সাধ্য হয়।

'ভক্তিরত্নাকরে' দেখা যায় যে, শ্রীনিবাস যখন নরহরি সরকার

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৪৬, পৃঃ ৬৪

ঠাকুরের কাছে নীলাচল যাত্রার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি শ্রীনিবাস কে বলেন "যাহ শীঘ্র বিলম্ব না সয়"। তিনি ইহাও শ্রীনিবাসকে বলিয়া দেন যে, অদ্বৈত প্রভু 'তর্জা' পাঠাইয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রভু "করিবেন এই লীলা সঙ্গোপন"। কাজেই শ্রীচৈতন্য-দর্শনে উদ্বিগ্ন-চিত্ত শ্রীনিবাস কালবিলম্ব না করিয়া যে সত্বরই নীলাচল যাত্রা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। 'ভক্তি-রত্নাকর', 'অনুরাগবল্লী' প্রভৃতি গ্রন্থেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায় এবং আরও দেখা যায় যে, শ্রীনিবাস নীলাচলে গমনকালে পথের মধ্যেই মহাপ্রভুর অপ্রকট-বার্তা শ্রবণ করেন। মহাপ্রভুর তিরোভাব হয় ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই শ্রীনিবাস এই বছরেই যে নীলাচল-যাত্রা করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

ইহা ছাড়া আরও দুইটি অকাট্য প্রমাণ আছে, যাহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর তিরোধানের বছরই নীলাচল-যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের দুইজন সাক্ষাৎ শিষ্য—বাহাদুরপুর-নিবাসী কর্ণপূর কবিরাজ এবং ভরতপুর-কাঞ্চনগড়িয়ার অধিবাসী নৃসিংহ কবিরাজ। ইহারা উভয়েই সু-কবি। কর্ণপূর কবিরাজ শ্রীনিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "শ্রীনিবাস-গুণলেশ-সূচক" এবং নৃসিংহ কবিরাজ লিখিয়াছেন "নব-পদ্য"।

নরহরি চক্রবর্তী-রচিত 'নরোত্তমবিলাসে'র দ্বিতীয় বিলাসে কর্ণপূর কবিরাজের "শ্রীনিবাস গুণলেশসূচক" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কর্ণপূর কবিরাজ লিখিয়াছেন—

> গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথি শ্রুতশ্চৈতন্য সঙ্গোপনং
> মূর্চ্ছীভূয় কচান্ লুনন স্বশিরসো ঘাতং দধদ্ধিক্কৃতঃ।
> তৎপাদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং
> সোঽয়ংমে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

—নরোত্তমবিলাস, ২য় বিলাস[১]

১ বহরমপুর সংস্করণ (বঙ্গাব্দ ১৩২৮) পৃঃ ১৭

এই 'সূচকে' শ্রীনিবাসের সহিত নরহরি সরকার ঠাকুর এবং রঘুনন্দনেরও দেখাসাক্ষাতের বিষয় বর্ণিত আছে—

গচ্ছন্ যঃ পথি খণ্ডসংজ্ঞনগবে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়ং
নত্বা শ্রীসরকারঠক্কুববরং নীত্বা তদাজ্ঞাং তথা।
তৎপশ্চাদ্ রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বাগতো যঃ স্মরন্
সোহয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥
—নরোত্তমবিলাস, ২য় বিলাস[১]

'ভক্তিরত্নাকরে' (৩য় তরঙ্গ)[২] শ্রীনিবাসের অপর শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের 'নব পদ্য' হইতে উদ্ধৃতাংশে দেখা যায়—

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘৈঃ সমুহুর্মুমূর্চ্ছ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ার্মভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান॥

কর্ণপূর কবিরাজ বলিতেছেন, শ্রীনিবাস নীলাচলে যাইতে পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানবার্তা শ্রবণ করিলেন, আর নৃসিংহ কবিরাজ বলিতেছেন, শ্রীনিবাস নীলাচলে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীচৈতন্যের প্রকট-লীলা সঙ্গোপনবার্তা লোকমুখে শুনিয়া অতি দুঃখে পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস নীলাচলের পথে কতদূর অগ্রসর হইবার পর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাববার্তা শ্রবণ করিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের বছরেই যে তিনি নীলাচল যাত্রা করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই সময়ে শ্রীনিবাসের বয়স যে অন্ততঃ ১৫ বছর ছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মহাপ্রভুর তিরোধান হয় ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই সিদ্ধান্ত হইল যে, ১৫৩৩—১৫ = ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্তী সময়ে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর

১ বহরমপুর সংস্করণ (বঙ্গাব্দ ১৩২৮) পৃঃ ১৮

২ গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ (১৯৪০) পৃঃ ৬৫

বিমানবিহারী মজুমদারও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীনিবাস ১৫১৭/১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

এখন দেখিতে হইবে শ্রীনিবাস কত বছর বয়সে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন।

'প্রেমবিলাসে' (পঞ্চম বিলাস) দেখা যায়, শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন প্রয়াগ ছাড়িয়া কিছুদূর যাইবার পর শুনিলেন যে, সনাতন গোস্বামী চারি মাস হইল অপ্রকট হইয়াছেন। ইহার পর যখন তিনি মথুরায় গিয়া পৌঁছিলেন, তখন শুনিতে পাইলেন—

প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট।
তাহা বহি কতদিন রঘুনাথ ভট্ট॥
শ্রীরূপ গোসাঞি এবে হইলা অপ্রকট।
শরীর না রহে প্রাণ করে ছটফট॥

—প্রেমবিলাস, পঞ্চম বিলাস[২]

'ভক্তিরত্নাকরে' (৪র্থ তরঙ্গ) আছে যে, শ্রীনিবাস যখন মথুরায় উপনীত হন, তখন শুনিতে পাইলেন--

এই কথোদিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন
মো সবার নেত্র হইতে হইলা অদর্শন॥
এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।
দেখিয়া আইনু—সে দুঃখের সীমা নাঞি॥[৩]

ইহা হইতে বোঝা যায় যে, রূপ-সনাতন একই বছরে অল্পদিনের ব্যবধানে অপ্রকট হইয়াছেন, অথচ 'প্রেমবিলাস' অনুসারে রূপ-সনাতনের অপ্রকট সময়ের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে অন্ততঃ ৪।৬ মাস। এখন এই দুই মতের কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

১ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৪০০

২ বহরমপুর সংস্করণ (বঙ্গাব্দ ১২৯৮) পৃঃ ৫৭

৩ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০) শ্লোক ১৯৭-১৯৮, পৃঃ ৮২

রাধাকুণ্ড হইতে প্রকাশিত "বৈষ্ণব ব্রতোৎসব নির্ণয় পত্রে"[১] দেখা যায় যে, সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় (গুরু পূর্ণিমা) এবং রূপ গোস্বামীর তিরোভাব শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে।

সনাতন গোস্বামী "বৈষ্ণবতোষণী" সম্পূর্ণ করেন ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই এই পর্যন্ত সনাতন গোস্বামী যে জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলিয়াছেন[২] যে, "বৈষ্ণবতোষণী" সম্পূর্ণ করিবার পরও রূপ-সনাতন বছর দশেক জীবিত ছিলেন বলিয়া বৃন্দাবনে কিম্বদন্তী আছে। এই কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই সম্ভবতঃ 'বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী'তে রূপ-সনাতনের তিরোধান ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ধরা হইয়াছে। "শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস" প্রণেতা নবদ্বীপ দাস তদীয় গ্রন্থে (পৃঃ ২০)। লিখিয়াছেন— "শ্রীরূপ সনাতনের আবির্ভাব ও তিরোধানের সময় বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। বিশ্বকোষ, 'বৈষ্ণবদিগ্‌-দর্শনী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস, গৌরপদতরঙ্গিণী, ব্রজের কথা প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্নতা দেখা যায়। বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণের সেবাইত পূজনীয় শ্রীবনমালী গোস্বামী মহোদয়ের নিকট সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন নির্ণয় নামক এক প্রাচীন কাগজ আছে। তাহাতে শ্রীগোস্বামী পাদগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সময় লিখিত আছে। এই পুরাতন কাগজের সহিত ও পূর্ব্ববর্ণিত গ্রন্থাদির সহিত ঐক্য দেখা যায় না। অবশ্য সময়ের পার্থক্য বেশী নহে। ভক্তি-রত্নাকরের বর্ণনামতে দেখা যায় যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বৃন্দাবন যাইবার পথমধ্যেই একজনের পর আর একজনের তিরোভাব শুনিতে পাইলেন অর্থাৎ শ্রীরূপ ও সনাতনের অন্তর্দ্ধানের কালমধ্যে অতি অল্প সময়ের ব্যবধান ছিল। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদের

১ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৪০১

২ ঐ

সূচকে দেখা যায় যে, শ্রীসনাতন পূর্ব্বে অপ্রকট হয়েন। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদের আবির্ভাব ১৪৮২ খৃঃ এবং তিরোভাব ১৫৬৪ সালের আষাঢী পূর্ণিমার দিবস এবং শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের প্রাকট্য ১৪৮৫ খৃঃ এবং অন্তর্দ্ধানের সময় ১৫৬৪ সালের শ্রাবণ শুক্লা-দ্বিতীয়া।"

এখানেও দেখা যায়, ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দেই রূপ-সনাতনের অপ্রকটের কালনির্ণয় করা হইয়াছে। তবে একটি বিষয়েব পার্থক্য দেখা যায়। "বৈষ্ণব ব্রতোৎসব নির্ণয় পত্রে" শ্রাবণ মাসেব শুক্লা-দ্বাদশীতে রূপ গোস্বামীর তিরোভাব ধরা হইয়াছে, আব এই স্থলে ধরা হইয়াছে শ্রাবণ মাসের শুক্লা-দ্বিতীযা। তফাত শুধু তিথির। তবে আমাদের বর্তমান পঞ্জিকায় যখন "বৈষ্ণব ব্রতোৎসব নির্ণয় পত্রে"র মত গৃহীত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবসমাজ যখন এই মত মানিয়া লইয়াছেন, তখন আমবাও এই মতই গ্রহণ করিতেছি। কেননা এই মতের মধ্যে কোনও গলদ থাকিলে অবশ্যই তাহা এতদিনে ধবা পড়িত।

এখন কথা হইতেছে যাঁহারা মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া ("ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ") বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনায নিজেদেব উৎসর্গ করিলেন, তাঁহাবা ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দেব পর চুপচাপ দশবছর প্রকট রহিলেন, না করিলেন একখানি গ্রন্থ বচনা, এমন কি তাঁহাদেব সম্বন্ধে আর কোন কথা শোনাও গেল না। ইহাব উত্তবে বলা চলে যে, সে সময়ে তাঁহাদের বয়সও হইযাছে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবও সর্ববিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই জীবনের অবশিষ্ট কাল ভজন-সাধন লইয়াই হয়তো তাঁহারা অতিবাহিত করিয়া ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অপ্রকট হইয়াছেন। এই অনুমান ব্যতীত তাঁহাদের অপ্রকট কাল নির্ণয়ের আর কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র নাই।

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রূপ-সনাতনের অপ্রকট কাল ধরিলে বুঝিতে হইবে, শ্রীনিবাস ঐ বছরেই বৃন্দাবন গিয়া পৌঁছিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ বা তন্নিকটবর্তী সময়ে।

কাজেই শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে উপনীত হন, তখন তাঁহার বয়স মোটামুটি ৪৬ বছর। তাই 'ভক্তিরত্নাকরে' (৪র্থ তরঙ্গ) দেখা যায়, শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের পথে যখন গয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন লোকে তাঁহাকে এক মধ্যবয়সী পরমানন্দময় মূর্তিরূপেই সন্দর্শন করিয়াছে—

কিবা মধ্য যৌবন পরমানন্দময়।
দেখিলে বারেক সঙ্গ ছাড়িতে নারয় ॥[1]

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীনিবাসের ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন-গমন অস্বীকার করিয়াছেন।[2] তাঁহার যুক্তি হইল, শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের গোবিন্দ মন্দিরে সর্বপ্রথম দেখা হয়। এই গোবিন্দ মন্দির ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ নির্মাণ করান। কাজেই যে মন্দিরে শ্রীজীবাদির সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা যে মানসিংহের নির্মিত মন্দিরেই তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন যাইতে পারেন না।

ডক্টর নাথের এই সিদ্ধান্তের কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (অন্ত্য, ১৩শ পরিচ্ছেদ) দেখা যায় যে, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী "নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।"[3] 'ভক্তি-রত্নাকর' (৪র্থ তরঙ্গ[4]), 'অনুরাগবল্লী' (৩য় মঞ্জরী[5]) প্রভৃতি-গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে উপনীত হইবার পূর্বেই রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর তিরোভাব হইয়াছে। সুতরাং বোঝা যায় যে, মানসিংহের পূর্বেই রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী একটি গোবিন্দ মন্দির নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। কাজেই এই গোবিন্দ মন্দিরেই শ্রীজীবের সহিত

১ গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ (১৯৪০) শ্লোক ১৮০, পৃঃ ৮০
২ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা (৪র্থ খণ্ড), পৃঃ ২০
৩ ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত (১৯৬৩) পৃঃ ৫৬৯
৪ গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ (১৯৪০), শ্লোক ১৯৬, পৃ. ৮২
৫ মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত (৩য় সং), পৃঃ ১৭

শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথের সিদ্ধান্ত কখনই গৃহীত হইতে পারে না।

গোবিন্দ মন্দিরে শ্রীজীবের সহিত শ্রীনিবাসের প্রথম যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে 'বন্ধু' বলিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করেন।[১] ইহাতে মনে হয়, শ্রীজীব ও শ্রীনিবাস উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, অথবা শ্রীজীব কিছু ছোট ছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীজীব শ্রীনিবাসের কাছে যে সব পত্র[২] লিখিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে এই ধারণা আরও দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়, যথা—প্রথম পত্রে "স্বস্তি মদীয়সমস্ত-সুখপ্রদ-পদদ্বন্দ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু", দ্বিতীয় পত্রে "স্বস্তি সমস্তগুণপ্রশস্ত বন্ধুবর শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যমহত্তমেষু, তৃতীয় পত্রে রামচন্দ্র কবিরাজকে লেখা "শ্রীমদাচার্য্যমহাশয়াস্তত্র তাম্ উপদেক্ষ্যন্তি, 'এতে হি অস্মাকং সর্ব্বস্বমেবেতি।"

বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টগোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি শ্রীজীবের নিকট অধ্যয়ন করেন। ছাত্র হিসাবেও তিনি ছিলেন বিশেষ মেধাবী। শ্রীজীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "আচার্য"—পদবী দান করেন।

শ্রীনিবাস তিনবার বৃন্দাবন গিয়াছিলেন—

তিনবার বৃন্দাবন গমনাগমন।
সংক্ষেপে করিয়া কিছু কৈল নিবেদন॥

—অনুরাগবল্লী, ৬ষ্ঠ মঞ্জরী[৩]

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথমবার যখন তিনি বৃন্দাবনে যান, তখন তাঁহার বয়স মোটামুটি ৪৬ বৎসর। তখন তাঁহার বিবাহাদি হইয়াছে। কিন্তু গোপাল ভট্ট বিবাহিত ব্যক্তিকে দীক্ষা দিবেন না আশঙ্কায় সে কথা গোপন রাখেন। গৌড়ে প্রত্যাগমনের পর পুনরায় যখন তিনি বৃন্দাবনে যান, তখন তাঁহার ফিরিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া

১ ভক্তিরত্নাকর, গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ (১৯৪০), শ্লোক ২৭০, পৃঃ ৮৪
২ ঐ, ১৪শ তরঙ্গ, গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ (১৯৪০), পৃঃ ৬৩২-৬৩৩
৩ মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত, ৩য় সং পৃঃ ৪২

যাজিগ্রামে তাঁহার প্রথমা পত্নী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী চিন্তা করিতে থাকেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি রামচন্দ্র কবিরাজকে শ্রীনিবাসের খোঁজে বৃন্দাবনে পাঠান। রামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবনে গিয়া গোপাল ভট্টের সহিত দেখা করিয়া সব কথা বলেন। সব শুনিয়া তিনি দুঃখিত হন এবং শ্রীনিবাসকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন—

গোসাঞি কহে এত মিথ্যা কহিলা আমারে।
কোন্ ধর্ম্ম বুঝিয়াছ বুঝিব বিচারে॥

-অনুরাগবল্লী, ৬ষ্ঠ মঞ্জরী[১]

শ্রীনিবাস অকপটে সমস্ত দোষ স্বীকার করিলেন।

ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন।
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন॥
শ্রীজীব গোসাঞি সঙ্গ বৃন্দাবন বাস।
সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস॥
এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে।
এই লোভে করিয়াছো সঙ্কোচিত মনে॥
এত কহি ঠাকুর দণ্ড-প্রণাম করিল।
হাসি হাসি ভট্ট গোসাঞি আলিঙ্গন কৈল॥
মিথ্যা কহিয়াও তুমি জিনিলে আমারে।
কিছু দোষ নাহি ইথি কহিল তোমারে॥

—অনুরাগবল্লী, ৬ষ্ঠ মঞ্জরী[২]

শ্রীজীবের প্রতি রূপ-সনাতনের স্বপ্নাদেশ ছিল যে, অধ্যয়ন-শেষে সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থ শ্রীনিবাসের সহিত গৌড়দেশে প্রচারের জন্য পাঠাইতে হইবে। তদনুসারে যে সব গ্রন্থের রচনা এবং সংশোধন তৎকালে শেষ হইয়াছিল, তাহাই শ্রীনিবাসের সহিত পাঠাইবার

১ মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, ৩য় সং, পৃঃ ৩৯
২ ঐ ৩য় সং, পৃঃ ৩৯-৪০

ব্যবস্থা করা হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীনিবাসের প্রতি শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয় —

রহিল যে গ্রন্থ পরিশোধন করিব।
বর্ণিব যে সব তাহা ক্রমে পাঠাইব॥

-- ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ[১]

গৌড়দেশে যাত্রা করিবার আগে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ দাস-গোস্বামীর নিকট বিদায় লইবার জন্য রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের সঙ্গে রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসেন এবং পরে বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীবাদির সহিত মথুরা পর্যন্ত গমন করেন। লোকনাথ, ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি সমবেত হইয়া শ্রীনিবাসাদির বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। ইঁহারা ছাড়া বৃন্দাবন-বাসী আরও অনেক ভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যথা—

মাধব—বৃন্দাবনে এই নামে দুইজন ভক্ত ছিলেন (শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী পৃঃ ১৫০)। বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথের গৃহে শ্রীগোপালজীকে যখন লুকাইয়া রাখা হয়, তখন সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে যে সব ভক্ত বিগ্রহ-দর্শনে যাইতেন, তাহার মধ্যে দুইজন মাধবের নাম পাওয়া যায়। কাজেই-ইনি কোন্ মাধব, তাহা জানা যাইতেছে না। ইহা ছাড়া মাধব আচার্য নামে আর একজন ভক্ত ছিলেন। ইনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুড়তুতো ভাই এবং মহাপ্রভুর শ্যালক। মহাপ্রভুর আদেশে অদ্বৈত প্রভুর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে ইনি সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবনে অবস্থান করেন—

সন্ন্যাস করিয়া তেঁহো রহি বৃন্দাবন।
ব্রজের মধুর ভাবে করয়ে ভজন॥

—প্রেমবিলাস, ১৯[২]

ইনি কাটোয়ায় দাস গদাধরের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন (ভ. র ৯।৩৯৪) এবং খেতরি উৎসবেও ইনি গমন করেন (ভ.র ১০।৩৭৩)।

---

১ গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ (১৯৪০), শ্লো—২৬৪, পৃঃ ৩০৯

২ বহরমপুর সং (বঙ্গাব্দ ১২৯৮) পৃঃ ৩২০

মাধবের মাতা পুত্রকে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে ইনি বৃন্দাবনে পলায়ন করেন ও মাতার মৃত্যুর পর দেশে ফিরিয়া আসেন। পরে পুনরায় ইনি বৃন্দাবনে গমন করেন (শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, পৃঃ ১৫৩)। কাটোয়া এবং খেতরির উৎসবে যখন ইনি যোগদান করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, হয় তিনি সেই সময় গৌড়দেশেই ছিলেন, আর বৃন্দাবনে যদি থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীনিবাসাদির গৌড় আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও-গৌড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।

পরমানন্দ ভট্টাচার্য—গদাধর পণ্ডিতের শাখার অন্তর্ভুক্ত। ইনি ও মধু পণ্ডিত দুইজন একত্রে বৃন্দাবনে থাকিতেন।

মধু পণ্ডিত—গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। বৃন্দাবনে বংশী বটের নিকটে গোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেবা প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রেমী কৃষ্ণদাস—ভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য। কবিরাজ গোস্বামীকে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিতে যাঁহারা আদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনিও একজন।

কুমুদানন্দ চক্রবর্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস।

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৮[১]

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—গদাধর শাখা।

রাঘব গোস্বামী—গোবর্ধনে বাস করিতেন। ইনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে লইয়া বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

যাদব আচার্য—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা ও মহাপ্রভুর শ্যালক। ইনি বৃন্দবনে বাস করিতেন।

শ্রীযাদবাচার্য্যগোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৮[২]

পুণ্ডরীকাক্ষ ও ঈশান—ইঁহারা বৃন্দাবনবাসী ভক্ত।

---

১ 'সাহিত্য অকাদেমী' সং (১৯৬৩), পৃঃ ৩৯
২ ঐ

পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান আর লঘু হরিদাস।

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৮[1]

গোবিন্দ—বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

বাণীকৃষ্ণদাস গৌরভক্ত, বৃন্দাবনবাসী।

উদ্ধব—গদাধর পণ্ডিতের শাখা। বৃন্দাবনে বাস করিতেন।

দ্বিজ হরিদাস চৈতন্য শাখা। ইনি শেষ জীবনে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। নিবাস ছিল বর্ধমান জিলার কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। ইঁহার দুই পুত্র।

গোপালদাস এই নামে শ্রীজীবের এক শিষ্য ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি সেই লোক। ইনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন।

কৃষ্ণদাস অধিকারী শ্রীজীবের ছাত্র। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন দীপিকার 'প্রভা' নামক বৃত্তিকার।

শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী।

—ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ শ্লোক ৮০৫[2]

কেহ কেহ ইঁহাকে শ্রীজীবের মন্ত্রশিষ্য বলিয়া মনে করেন। ইহা সত্য নহে। সাধন দীপিকায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে- "শ্রীকৃষ্ণদাসনামা ব্রাহ্মণো গৌড়ীয়ঃ শ্রীমজ্জীববিদ্যাধ্যয়নে শিষ্যঃ, নতু মন্ত্রশিষ্যঃ।"

সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সহ গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন এবং অবশেষে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়া উপনীত হন। বীর হাম্বীর তখন বনবিষ্ণুপুরের রাজা। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেন, সম্ভবতঃ বীর হাম্বীরের রাজ্যাধিরোহণের অল্প পরেই শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরে উপনীত হন। এখন দেখিতে হইবে, বীর হাম্বীর কখন রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন? এ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সকল মত খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বীর হাম্বীর ১৫৭৫

১ "সাহিত্য অকাদেমী" সং (১৯৬৩), পৃঃ ৩০২

২ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন (১ম সং), পৃঃ ৪৬

৩ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), পৃঃ ৩৮

খ্রীষ্টাব্দে রাজাধিরোহণ করেন[১]। সুতরাং এই বছরই বৈষ্ণব গ্রন্থাদি লইয়া শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরে আসিয়া উপনীত হন।

পূর্বেই বলিয়াছি শ্রীনিবাসের সহিত কতকগুলি গোস্বামিগ্রন্থ প্রচারের জন্য বাঙলাদেশে পাঠান হয়। গ্রন্থগুলিকে বাক্সে ভরিয়া গোরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়া কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসাদির সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। গ্রন্থাদিসহ গাড়ি যখন বিষ্ণুপুরে আসে, তখন পূর্ণগ্রন্থ গোরুর গাড়ি লুঠ হয় এই ঘটনা কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন। "১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যালফ ফিচ বাঙলাদেশ পরিদর্শন করিয়া লেখেন যে, উত্তর ভারত হইতে বাংলায় আসিবার পথ চোর-ডাকাতে ভর্তি।" কাজেই গাড়িতে ধন-রত্ন আছে সন্দেহে দুর্বৃত্তদল তাহা লুঠ করিতে চাহিলে বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছিবার বহু পূর্বেই তাহা করিতে পারিত। সপ্তদশ শতকের প্রথম-পাদ পর্যন্ত বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন ও নবীন রাজ-বংশ, তথাকথিত বার ভূঁইয়া ও ছোট-বড় অনেক জমিদারের শাসন অব্যাহত ছিল। বনবিষ্ণুপুরের রাজ-বংশ ৬৯৫[২] খ্রীষ্টাব্দে মল্লাব্দ প্রবর্তন করেন। এই রাজ বংশের সম্মান ছিল খুব বড়। বাহারিস্তান-ই-গায়েবি (৯ম পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড) পাঠে বোঝা যায়, বীর হাম্বীর ছিলেন বিশেষ শৌর্য-বীর্যশালী ও রণদক্ষ নরপতি। অপরিচিত লোকে মাল বোঝাই গাড়ি লইয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে তাহা জানা দরকার। কাজেই বীর হাম্বীরের লোকজন স্বভাবতঃই তাহা আটক করিয়াছে। বীর হাম্বীর রাজা ছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া অমানুষ ছিলেন না। মনুষ্যত্বের আবেদন ছিল তাঁহার নিকট সকলের উপরে। তাই দেখা যায়, গাড়ি যাহারা আটক করিয়াছে, তাহারা গাড়ির লোকজন কাহাকেও মারিয়া ফেলিয়াছে কিনা, বার বার তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কাহু

১ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৪০১-৪০৩
২ ঐ, পৃঃ ৪০২

না বধিলা সত্য বলহ আমারে।"[1] গ্রন্থরাজি সন্দর্শনে তাঁহার মনে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি ব্যথিত অন্তঃকরণে বলিতেছেন—

কুন মহাশয়ের অন্তরে দিলু ব্যথা।
তাঁর কোপানলে ভস্ম হইব সর্বথা॥
যদি পাই এই গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন।
তবে ত' তাঁহার পায়ে লইব শরণ॥[2]

বার হাম্বীরের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। অচিরেই তিনি শ্রীনিবাসের দর্শন পাইলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

শ্রীনিবাস সব বৈষ্ণব গ্রন্থ যে একসঙ্গে আনেন নাই, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। গোবিন্দ কবিরাজের নিকট শ্রীজীবের এক পত্র হইতেও (ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ, ৭র্থ পত্র) ইহা জানা যায় -"শ্যামদাস-মার্দ্দঙ্গিকহস্তেন শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগোস্বামিনে বৃহদ্ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ, তত্র প্রাপ্তং নবেতি বিলিখ্য বয়ং সন্দেহ-হন্নিবর্ত্তনীয়াঃ," অর্থাৎ খোলবাদক শ্যামদাসের হাতে শ্রীনিবাস আচার্যের জন্য বৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠান হইয়াছে, তিনি উহা পাইলেন কিনা এবং পড়িয়া বুঝিলেন কিনা জানিতে চাহি। গোপাল চম্পূও (যাহার পূর্বাভাগ ১৫১০শক = ১৫৮৮[3] খ্রীষ্টাব্দে ও উত্তরভাগ ১৫১২ শকাব্দ = ১৫৯২[4] খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়) শ্রীনিবাস প্রথমবারে আনেন নাই। দ্বিতীয়বার যখন তিনি বৃন্দাবনে যান, তখন শ্রীজীব তাঁহাকে

১ ভক্তিরত্নাকর ৭ম তরঙ্গ, শ্লোক ৯০, গৌড়ীয় মিশনের সংস্করণ (১৯৪০), পৃঃ ৩৪৩

২ ঐ ৭ম তরঙ্গ, শ্লোক ৯৪-৯৫, ঐ ঐ

৩ পূর্ব-চম্পূর শেষে লিখিত আছে--"সম্বং পঞ্চকবেদষোড়শযুতং শাকং দশেষেকভাগ, জাতং যহি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্'—'যখন ১৬৪৫ সম্বৎ এবং ১৫১০ শকাব্দ তখনই এই গোপালচম্পূ বিলিখিত হইল'।

৪ উত্তর চম্পূর শেষে লিখিত আছে—"পবন-কলামিতি সম্বহিন্দন্ বৃন্দাবনান্তঃস্থঃ। জীবঃ কশ্চন চম্পূং সম্পূর্ণাঙ্গীচকার বৈশাখে।—বৃন্দাবনস্থ জীবনামা কোনও ব্যক্তি ১৬৪৯ সম্বতে, অথবা ১৫১৪ শকাব্দায় বৈশাখমাসে এই চম্পূ সমাপ্ত করিয়াছেন।

গোপালচম্পূ-গ্রন্থারম্ভ শুনাইলেন, এবং আর যে সব গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহাও দেখাইলেন—

শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা।
আর যে যে গ্রন্থ কৈল তাহা দেখাইলা॥
—ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ[১]

চৈতন্যচরিতামৃতও শ্রীনিবাস প্রথমবারে বৃন্দাবন হইতে আনেন নাই। কেননা চৈতন্যচরিতামৃতে গোপালচম্পূর উল্লেখ আছে—"গোপাল-চম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর" (২।১)। সুতরাং শ্রীনিবাস যদি দ্বিতীয়বারে বৃন্দাবন গিয়া গোপালচম্পূর আরম্ভ শুনেন, তাহা হইলে প্রথমবারে বাঙলাদেশে তিনি চরিতামৃত আনিতে পারেন না। কাজেই বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ-চুরির সংবাদে কবিরাজ গোস্বামীর আত্ম-হত্যার সংবাদ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি বৃন্দাবনে যাইবার আগে শ্রীনিবাসের প্রথমবার বিবাহ হয়। স্ত্রীর নাম দ্রৌপদী। শ্রীনিবাস তাঁহাকে দীক্ষা দেন এবং দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার নাম হয় ঈশ্বরী। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়া বা গৌরপ্রিয়া।

যাজিগ্রামে ফিরিয়া শ্রীনিবাস চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। গোস্বামিগ্রন্থের পঠন-পাঠনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিজ হরিদাসের পুত্রদ্বয় গোকুলদাস ও শ্রীদাস শ্রীনিবাসের প্রথম ছাত্র। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজও শ্রীনিবাসের ছাত্র। ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যাজিগ্রামের চতুষ্পাঠীতে ক্রমেই ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—

যাজিগ্রামে বিলসয়ে লৈয়া শিষ্যগণ।
গোস্বামীর গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন॥

১ গৌড়ীয় মিশনের সংস্করণ (১৯৪০), শ্লোক ১০৭, পৃঃ ৩৮৪

যৈছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত গোস্বামী প্রকাশে।
তৈছে ব্যাখ্যা করান আচার্য্য শ্রীনিবাসে॥
কুমতাবলম্বী শুনি' ভক্তির ব্যাখ্যান।
দূরে পলায়েন যৈছে সিংহভয়ে শ্বান॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি - জানি' পণ্ডিতের গণ।
শ্রীনিবাসপদে আসি' মাগয়ে শরণ॥

—ভক্তিরত্নাকর, ৭ম তরঙ্গ[১]

ইহা হইতে মনে হয়, বাঙলাদেশে দার্শনিক ভিত্তিতে ভক্তিবাদের প্রচার শ্রীনিবাসই প্রথম প্রবর্তন করেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগেও বৈষ্ণবাচার্যগণের বাঙলাদেশে যাতায়াত ছিল, কিন্তু দার্শনিক পট-ভূমিকায় ভক্তি-ধর্মের কেহ প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। শ্রীনিবাস গোস্বামিগ্রন্থের মাধ্যমে ভক্তিবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করেন। ফলে তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিও ভক্তিবাদে আকৃষ্ট হন এবং গোস্বামিগ্রন্থসমূহ হিন্দুশাস্ত্রের পর্যায়ে পরিগণিত হয়।

ভাগবত পাঠেও শ্রীনিবাসের ছিল অসাধারণ দক্ষতা। অবশ্য পূর্বেও বাঙলাদেশে ভাগবত পাঠ হইত। বিশেষতঃ বীর হাম্বীরের সভায় নিত্য ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা ছিল। তবে বৃন্দাবন-গোস্বামিগণের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা কেহ জানিত না। শ্রীনিবাস সর্ব-প্রথম বাঙলাদেশে এইরূপ মধুর ব্যাখ্যার প্রচলন করেন। তাই দেখা যায়, বীর হাম্বীরের সভায় যখন তিনি পাঠ করিতেছিলেন, তখন—

সভামধ্যে সবার নেত্রেতে ঝরে জল।
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা হইলা বিহ্বল॥

—ভক্তিরত্নাকর, ৭ম তরঙ্গ[২]

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪৯), শ্লো—৬৩১-৬৩৪, পৃঃ ৩৬১
২ ঐ শ্লো—১৪৯, পৃঃ ৩৪৫

আবার ঠাকুর নরহরির তিরোভাব তিথিতে যখন তিনি ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, তখন সেই পাঠ শুনিয়া—

আত্মবিস্মরিত কেহ মনে মনে কয়।
—"শ্রীশুক অর্পিল শক্তি, তেঞি ঐছে হয়॥"
কেহ কহে—"শক্তি সঞ্চারিল বেদব্যাস।
তেঞি এ অদ্ভুত অর্থ করয়ে প্রকাশ॥"
কেহ কহে—"গদাধর পণ্ডিত গোসাঞী।
বুঝি, কৃপা-শক্তি পূর্ণ প্রকাশে এথাই॥"
কেহ কহে—"পণ্ডিত শ্রীবাসাদি কৃপায়।
ঐছে পাঠলালিত্য—কি তুলনা ইহার॥"
কেহ কহে—"গৌরপ্রেমস্বরূপ এ হন।
এ মুখে সে বক্তা—তেঞি ঐছে আকর্ষণ।"

—ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ[১]

শ্রীনিবাস ছিলেন কীর্তন-রসিক এবং কীর্তনের প্রসারের জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল—

"দিবা নিশি সঙ্কীর্ত্তন রসে মগ্ন হৈলা।"

- ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ[২]

সংক্ষেপে বলা যায় যে, গোস্বামিগ্রন্থের পঠন-পাঠন, ভাগবত পাঠ ও রস-কীর্তনের প্রসার দ্বারা শ্রীনিবাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। শ্রীনিবাস ছিলেন ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ। তাঁহার ভক্তিভাবে সহজেই লোকে আকৃষ্ট হইত। ধনী-বিদ্বান নির্বিশেষে বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ তিনি গৌড়ে গোস্বামিগ্রন্থ প্রচারের ভার পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি বীর হাম্বীরের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর শ্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় হয়। বন-

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লো—৫৪৬ ৫৫০, পৃঃ ৩১৯
২ ঐ শ্লো-৮৮৫, পৃঃ ৪২

বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের চেষ্টা চলে এবং সমগ্র মল্লভূমবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। মানভূম, ধলভূম, সিংহভূম (চাইবাসা), ভট্টভূম (রামগড়), শবরভূম (মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে সুবর্ণরেখা হইতে উত্তরে কংশাবতী নদী পর্যন্ত ভূভাগই শবর-ভূম ছিল)[১] প্রভৃতি অঞ্চলেও শ্রীনিবাস-কর্তৃক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসার হয়। এমন কি শিখরভূমেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করে। শিখরভূম বা পঞ্চকোট বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি[২] একটি রাজ্য। কাজেই বিষ্ণুপুর যখন বৈষ্ণবধর্মে প্লাবিত হয়, তখন শিখরভূমে তাহার ঢেউ লাগা আশ্চর্য নহে। বিশেষতঃ শ্রীনিবাসের অন্যতম শিষ্য গোকুল কবীন্দ্র তাঁহার পূর্ব-নিবাস কটুই ত্যাগ করিয়া পঞ্চকোটের সেবগড়বাসী হইয়াছিলেন। কাজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এদিকেও বিস্তার লাভ করা স্বাভাবিক। তবে শিখরভূমের রাজা হরিনারায়ণ শ্রীনিবাসের ভক্ত ছিলেন, শিষ্য নহে—

> শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ।
> আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তাঁর মন॥
> তেঁহো শিষ্য হইবেন শ্রীরামমন্ত্রেতে।
> স্বাভাবিক প্রীত তাঁর শ্রীরামচন্দ্রেতে॥
>
> —ভক্তিরত্নাকর, ৯ তরঙ্গ[৩]

হরিনারায়ণ রাম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক জানিয়া শ্রীনিবাস পত্র লিখিয়া বঙ্গক্ষেত্র হইতে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রকে পঞ্চকুটে (পঞ্চকোটে) আনাইয়া দীক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন—

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, ১ম খণ্ড (১ম সং) পৃঃ ২০৬

২ পুরুলিয়া হইতে ৩৫ মাইল ও সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের রামকানালি স্টেশনের কাছে পঞ্চকোটের রাজধানী ছিল।

৩ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লো—৩০৩-৩০৪, পৃঃ ৩৯১

তেঁহো পঞ্চকুটে আমি স্নেহাবিষ্ট মনে।
রামমন্ত্রে শিষ্য কৈল হরিনারায়ণে॥

--ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ[1]

শ্রীনিবাসের কবিত্ব শক্তিও ছিল অসাধারণ। হরিদাস বাবাজী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে (পৃঃ ১৩৯২) লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিবাস পাঁচটি 'পদ' রচনা করিয়াছেন। এই পাঁচটি 'পদে'র মধ্যে তিনটি আছে কর্ণানন্দে (৬ষ্ঠ নির্যাসে) এবং এই তিনটি 'পদ' পদকল্পতরুতেও (৭৯০, ৩০৭২, ৩০৭৩) উদ্ধৃত হইয়াছে। এই 'পদ' তিনটির দুইটি ব্রজবুলি ও একটি বাঙলা। বাঙলা 'পদটি' ভক্তিরত্নাকরেও (৬ষ্ঠ তরঙ্গ) আছে। ভক্তিরত্নাকর হইতে পদটি এখানে আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

বদন-চান্দ কুন্ কুন্দারে কুন্দিল গো,
কেনা কুন্দিল দু'টি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে গো,
সেই সে পরাণ তার সাক্ষী॥
রতন কাটিয়া কেবা যতন করিয়া গো
কে না গঢ়াইয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণে গো
যোগী হৈল উহারি ধিয়ানে॥
নাসিকা উপরে শোভে এ গজ মুকুতা গো
সোনায় মণ্ডিত তার পাশে।
বিজুরি-জড়িত কিবা চান্দের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
সুন্দর কপালে শোহে সুন্দর তিলক গো
তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
হিয়ার মাঝারে মোর ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি॥

[1] গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লো—৩০৮, পৃঃ ৩৯১

মদন ফাঁদুয়া ওনা চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়াছিল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুখ দেখিতে না পানু গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা॥
কেমন মধুর সে না বোল খানি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাও।
তেমন কবিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাও॥
করিবব কর জিনি বাহুব বলনী গো
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন মনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
তাহারি পরশ রস মাগে॥
ঠমকি ঠমকি যায় তেবচ নয়নে চায়
যেন মত গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাসে কয় ও রূপ লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়িল বিধাতা॥[১]

শ্রীনিবাস কবিত্ব শক্তি প্রকাশের জন্য এই 'পদ' রচনা করেন নাই। গৌড়-যাত্রার প্রাক্কালে গোবিন্দ-দর্শনে যাইয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন। শ্রীজীবের সঙ্গে তিনি বাসায় ফিরিলেন বটে; কিন্তু—

অনুরাগ প্রবল বাঢ়য়ে ক্ষণে ক্ষণে।
নিজকৃত গীত গায়—আপনা না জানে॥

—ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ[২]

সেই গীতটি হইতেছে উপরি-উক্ত এই 'পদ'। পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীনিবাসেব দান উল্লেখযোগ্য নয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদেব অবগতির জন্য জানান যায় যে, এই একটিমাত্র পদ হইতেই

১ পাঠান্তর আছে। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের "গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ" দ্রষ্টব্য (পাদ টীকা), পৃঃ ৪১৯

২ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লো—৪৫৯, পৃঃ ৩৩৬

শ্রীনিবাস বৈষ্ণব-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবার যোগ্য। এই 'পদটি' হইল শ্রীনিবাসের ব্যবহারিক জীবনের অনুভূতির ফল। বৃন্দাবনে তিনি ১০।১১ বছর (১৫৬৪ খ্রী. অ.—১৫৭৫ খ্রী. অ.) কাটাইলেন, কতবার তিনি ভক্তিভরে গোবিন্দ দর্শন করিলেন; কিন্তু এই দিনের মতো কোনদিন তাঁহার মানস-সমুদ্র উথলিয়া উঠে নাই। শ্রীনিবাসের মধ্যে কবিত্ব শক্তি ছিল; কিন্তু কল্পনার রথে আরোহণ করিয়া কবিতা রচনা দ্বারা সেই অন্তর্নিহিত শক্তির অপব্যবহার তিনি করেন নাই। এই জন্যই রচনা প্রাচুর্যে তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য ভরিয়া দিতে পারেন নাই। পরাণকে তিনি চেষ্টা করিয়া কাঁদান নাই, স্বভাবতঃই যখন কাঁদিয়াছে, তখনই তাহা এই কবিতার আকারে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় যথার্থই বলিয়াছেন—"সমগ্র পদাবলী সাহিত্যেও বোধ হয় ইহা অপেক্ষা সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ রূপ-বর্ণনার পদ বড় বেশী পাওয়া যাইবে না" (গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৪২০)।

শ্রীনিবাসের আর একটি সুন্দর পদ আছে অনুরাগবল্লীতে (৬ষ্ঠ মঞ্জরী[১])।

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি[২]
দুয়ার বাহিরে পরবাস।
আপন বলিয়া বোলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে
হেন ছারে হেন অভিলাষ॥
সজনি, তুয়া পায় কি বলিব আর।
সে দুলহ জনে অনু রকত যাহার মন
কেবল মরণ প্রতিকার॥
কি করিতে কিবা করি আপনা দঢ়াইতে নারি'
রাতি দিবস নাহি যায়।

১ মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত (৩য় সং), পৃঃ ৪৩

২ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক শোধিত পাঠ। (দ্রষ্টব্য—গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ), (১৯৬১ ক. বি.) পৃঃ ৪২০

গৃহে যত বন্ধুজন, সব মোর বৈরীগণ
কি করিব কি হবে উপায় ॥

'পদ'টি যেন অনুরাগের আকর। মনোহর দাস বলেন—

এই পদ তদাশ্রিত জনের জীবন।
শ্রবণ-সর্ব্বস্ব কিবা কণ্ঠ-আভরণ ॥
কিম্বা রসের সার অনুরাগ-খনি।
মধুরিমা-সীমা কিবা সুধার স্বর্ধুনী ॥

—অনুরাগবল্লী, ৬ষ্ঠ মঞ্জরী[১]

শ্রীনিবাসের পঞ্চম পদটি এতদিন সম্ভবতঃ অপ্রকাশিত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুথি হইতে উদ্ধার করিয়া ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার প্রকাশ করিয়াছেন। পদটি সম্ভোগের। সেটি এই—

ধনি রঙ্গিনি ভোর।
ভোলল কানু গরবে কার কোর ॥
ধনি মন মাতল সুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বই চাঁদমুখে ॥
ধনি মন মানয়ে বাধা।
কানু পরাভব জিতল রাধা ॥
ভূমে গড়ি যায় মোহন বেণু।
রতিরস অলসে অবশ ভেল কানু ॥
ভণে শ্রীনিবাস দাস।
রাই কানু রঙ্গ দেখি সখিগণ হাস ॥[২]

ইহা ছাড়া শ্রীনিবাস ভাগবতের "চতুঃশ্লোকী ভাষ্য" করিয়াছেন বলিয়া সাধনদীপিকায় (৯ম কক্ষায়) প্রকাশ।

১ মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত (৩য় সং), পৃঃ ৪৩

২ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ (১৯৬১—ক. বি.) পৃঃ ৪২১

শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের পরে বৈষ্ণব-সমাজে "ছয় চক্রবর্তী" ও "অষ্ট-কবিরাজ" বলিয়া দুইটি কথার চল হয়। "কর্ণানন্দে"[১] ইঁহাদের বিবরণ আছে—

(ছয় চক্রবর্তী)

শ্রীদাসগোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা ॥
ষট্ চক্রবর্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃত-বৈষ্ণব-সেবনাঃ ॥

ছয় চক্রবর্তী, যথা—

১। শ্রীদাস চক্রবর্তী
২। শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্তী
৩। শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্তী
৪। শ্রীব্যাস চক্রবর্তী
৫। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী
৬। শ্রীরামচরণ চক্রবর্তী

(অষ্ট কবিরাজ)

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যাষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্ন-মালাদানবিচক্ষণাঃ।

অষ্ট কবিরাজ, যথা —

১। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ
২। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ
৩। শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ
৪। শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ
৫। শ্রীভগবান্ কবিরাজ

১ ৬ষ্ঠ নির্যাস, বহরমপুর সং (১২৯৮), পাদটীকা, পৃঃ ১২২

৬। শ্রীবল্লবী কবিরাজ

৭। শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ

৮। শ্রীগোকুল কবিরাজ

ইহা ছাড়া" "ছয় ঠাকুর" কথাটিও শ্রীনিবাস নরোত্তমের পরে বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত হয়। এই ছয় ঠাকুর, যথা—

১। শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ

২। শ্রীকুমুদ চট্টরাজ

৩। শ্রীরাধাবল্লভ মণ্ডল

৪। শ্রীজয়রাম চক্রবর্তী ("প্রেমী জয়রাম")

৫। শ্রীরূপ ঘটক

৬। শ্রীঠাকুরদাস ঠাকুর

ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

শ্রীনিবাসের তিন পুত্র—বৃন্দাবন বল্লভ, রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দ গতি বা গতি গোবিন্দ। বৃন্দাবন বল্লভ ও রাধাকৃষ্ণ পূর্বেই মারা যান। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র গতি গোবিন্দের শাখাই এখন বর্তমান আছেন। শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম হেমলতা। ইঁহার বিবাহ হয় রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভের সহিত। দ্বিতীয়া কন্যার নাম—কৃষ্ণপ্রিয়া। বিবাহ হয় রামকৃষ্ণ চট্টরাজের ভ্রাতা কুমুদ চট্টরাজের পুত্র চৈতন্যের সঙ্গে। কনিষ্ঠা কন্যার নাম—কাঞ্চনলতিকা ওরফে যমুনা। ইঁহার স্বামীর নাম বা বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় না। অনুরাগবল্লীতে (৭ম মঞ্জরী) শ্রীনিবাসের শাখা-বর্ণনা আছে।

নরোত্তম

চৈতন্যের টানে ব্যাকুল হইয়া যে সব দৃঢ়-চরিত্র রাজকুমার ঘর-ছাড়া হন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছেন রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং দ্বিতীয়—ঠাকুর নরোত্তম। উভয়ই কায়স্থ-সন্তান এবং বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্র সাধনায় উভয়েরই উচ্চে স্থান।

নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, অনুরাগবল্লী, প্রেমবিলাস প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থে নরোত্তমের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

নরোত্তমের পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা নারায়ণী। রাজধানী ছিল অধুনাতন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত রাজসাহী জিলার পদ্মা-তীরবর্তী গোপালপুরে—

রাজধানী স্থান পদ্মাবতী তীরবর্তী।
গোপালপুর নগর সুন্দর বসতী ॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ[১]

নরোত্তম পরে বাস করিতেন গোপালপুর হইতে কিছু দূরে "খেতরি" নামে অপর এক স্থানে। রাজসাহী জিলার গেজেটিয়ারে (পৃঃ ১৩৪) দেখা যায়, এই স্থান রামপুর-বোয়ালিয়ার ১৩ মাইল পশ্চিমে এবং ষ্টীমারে গোদাগাড়ী যাইবার পথে "প্রেমতলী" স্টেশনের ২মাইল দূরে অবস্থিত। নরোত্তমের পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্ত ছিলেন গৌড়ের রাজকর্মচারী। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র সংস্কৃতে গোবিন্দদাস-রচিত লুপ্ত "সঙ্গীত মাধব নাটকের" প্রস্তাবনা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধার করেন এবং ডক্টর সুকুমার সেন "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"-গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৩৪) তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায়—"পদ্মাবতীতীরবর্তিগোপালপুর-নগরনিবাসী গৌড়াধিরাজমহামাত্যশ্রীপুরুষোত্তমদত্তসত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ। স হি শ্রীনরোত্তমদত্তসত্তমমহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ।"

নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই রঘুনাথের মতো বিষয়বিমুখ এবং ধর্মপরায়ণ। ১৬ বছর বয়সে তিনি গোপনে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই সংবাদ প্রকাশ পাইলে বাধার সৃষ্টি হইতে পারে ভাবিয়া বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে শ্রীনিবাসের মতো গৌড়ের তীর্থসমূহ দর্শনেরও তিনি সুযোগ করিতে পারেন নাই—

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), পৃঃ ২০

নবদ্বীপ আদি স্থান না করি দর্শন।
লোকভয়ে বনপথে চলে বৃন্দাবন॥
—নরোত্তমবিলাস, ২য় বিলাস[১]

পরিচিত কেহ দেখিতে পাইলে সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার আশঙ্কায় ১৫ দিন ধরিয়া তিনি অশান্তচিত্তে গমন করিতে থাকেন। যখন বুঝিলেন যে, গৃহ হইতে বহু দূরে তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি স্থির হইয়া পথ চলিতে পারেন

পঞ্চদশ দিবসের পথ ছাড়াইয়া।
ঘুঁচিল উদ্বেগ কিছু চলে স্থির হৈয়া॥
—নরোত্তমবিলাস, ২য় বিলাস[২]

জগৎবন্ধু ভদ্র বলেন (মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত "গৌরপদতরঙ্গিণী" পৃঃ ১৯) যে, নরোত্তম তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্তের (রায়) হস্তে রাজ্যভার দিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই মতের সমর্থন অন্যত্র পাওয়া যায় না। নরোত্তম যদি পিতৃব্য-পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া বৃন্দাবন যাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার গোপনে বৃন্দাবন যাওয়ার কি দরকার ছিল? ভক্তিরত্নাকরে (১ম তরঙ্গ)[৩] দেখা যায়—

অকস্মাৎ গৌড়রাজ-মনুষ্য আইল।
গৌড়ে রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল॥
এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিলা।
প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হৈলা॥

নরোত্তমের পিতা গোপালপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের রাজা ছিলেন। তাহা ছাড়া গৌড়রাজ-কর্তৃক নিয়োজিত জায়গীরদারের অধীনেও তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ইজারাস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

১ বহরমপুর সং (বঙ্গাব্দ—১৩২৮), পৃঃ ২২
২ ঐ পৃঃ ২২
৩ গৌড়ীয় মিশন সং, শ্লো: ২৮৭-২৮৮, পৃঃ ১৩

কাজেই গৌড়রাজ-দরবারে তাঁহাদের যাতায়াত ছিল। বিশেষতঃ পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্ত তো 'গৌড়াধিরাজমহামাত্য' ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে অধিকাংশ কাল গৌড়েই কাটাইতে হইত। সুতরাং এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, গৃহে পিতা-পিতৃব্যের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণেই নরোত্তম গোপনে বৃন্দাবন চলিয়া যান।

বৃন্দাবনে গিয়া নরোত্তম লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। লোকনাথ ছিলেন যশোহর জিলার তালখড়ি গ্রামের অধিবাসী—

যশোর দেশেতে তালখড়া-গ্রামে স্থিতি।
মাতা সীতা, পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ[১]

কালক্রমে বৃন্দাবন গহন কাননে পরিণত হইলে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে যে-সব শ্রীচৈতন্য-ভক্ত বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব প্রথম হইলেন এই লোকনাথ গোস্বামী।

নরোত্তম ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট। শ্রীজীব তাঁহার পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "ঠাকুর" উপাধি দান করেন। পঠদ্দশায় তিনি তাঁহার অপর দুই সতীর্থ শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। অবশ্য শ্রীনিবাসের কথা তিনি খেতরির এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, এখন স্বচক্ষে দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন (নরোত্তমবিলাস, ২য় বিলাস)।

বৃন্দাবন হইতে—শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ সহ তিনি গৌড়ে ফিরিয়া আসেন। পথে বনবিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস অপহৃত বৈষ্ণব গ্রন্থাদির অনুসন্ধানের জন্য অবস্থান করিতে থাকিলে তিনি শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি চলিয়া আসেন এবং কয়েকদিন পর শ্যামানন্দকে পাথেয় ও লোক সঙ্গে দিয়া উৎকলদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

দেশে ফিরিয়া নরোত্তম গৌড়ের সকল তীর্থ দর্শন করেন। ইহার পর তিনি উড়িষ্যায় যান। তথা হইতে ফিরিয়া তিনি মহা-

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লো ২২৬, পৃঃ ১৪

মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই মহোৎসবই বিখ্যাত "খেতরির মহোৎসব" নামে খ্যাত। এই উৎসব উপলক্ষে নরোত্তম "গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, রাধারমণ"—এই ছয় বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা প্রকট করেন। এই উৎসব দেশের সমাজ এবং সংস্কৃতির উন্নয়নেরও সহায়ক হয়। কেননা নরহরি উত্তরবঙ্গের তৎকালীন সমাজ ও লৌকিক ধর্মের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা মোটেই সুখকর নহে—

এদেশের লোক দস্যুকর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম বা কেমন॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটামুণ্ড লৈয়া।
খড়্গাকরে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায়॥
সবে স্ত্রী লম্পট, জাতি বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভূঞ্জয় কদাচিৎ॥[১]

ইহা হইতে বোঝা যায় যে, উত্তরবঙ্গের তৎকালীন সমাজ এবং ধর্মকর্মের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। এসব অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যের সময় বৈষ্ণবধর্ম খুব একটা স্থান পায় নাই। নরোত্তমই সর্বপ্রথম খেতরি গ্রামে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার পর হইতেই উত্তরবঙ্গে ইহার প্রসারের সূচনা বলা যাইতে পারে।

যে সময়ে নরোত্তম মহা-মহোৎসবের আয়োজন করেন, তখন বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসমাজ বহুবিস্তৃত হয় নাই। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, কণ্টকনগর, একচক্রা, আকাই-হাট শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম, কাঞ্চননগর প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণবের "পাট" ছিল। মোট কথা,

নরোত্তম-বিলাস, ৭ম বিলাস. বহরমপুর সং (বঙ্গাব্দ ১৩২৮) পৃঃ ৮৯

বৈষ্ণবের যে কয়েকটি "পাট", তাহা সবই পশ্চিমবঙ্গে,—উত্তরবঙ্গ বা বঙ্গের আর কোনও অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার তখনও হয় নাই।

মহাধিবেশনের দিন স্থির হইলে নরোত্তম সকল স্থানে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। কবি নরহরি চক্রবর্তী কাহাকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হইল তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, শুধু বলিয়াছেন—

শ্রীগৌড়মণ্ডলে ভক্তালয় যথা যথা।
নিমন্ত্রণপত্রী পাঠাইলা তথা তথা॥
উৎকলে মনুষ্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা।
শ্যামানন্দে এ সকল বৃত্তান্ত লিখিলা॥[১]

তবে যাঁহারা এই মহাধিবেশনে যোগদান করেন, তাঁহাদের নাম-ধাম অবশ্য ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এই মহাধিবেশনের সর্বাধ্যক্ষা ছিলেন জাহ্নবা দেবী। শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সকলেই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নানাস্থান হইতে আগত যে সব ভক্ত এই অধিবেশনে সমবেত হইয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের পরিচিতি দেওয়া হইল—

১। **রামচন্দ্র কবিরাজ**—শ্রীনিবাসের শিষ্য, পদকর্তা গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এবং শ্রীখণ্ডনিবাসী চিরঞ্জীব সেনের পুত্র।

২। **গোবিন্দদাস**—বিখ্যাত পদকর্তা এবং রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৩। **ব্যাসাচার্য**—রাজা বীর হাম্বীরের সভাপণ্ডিত এবং শ্রীনিবাসের শিষ্য।

৪। **কৃষ্ণবল্লভ**—বনবিষ্ণুপুরের নিকট দেউলি গ্রামের অধিবাসী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের সর্বপ্রথম শিষ্য। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে ব্রাহ্মণতনয়।
আচার্য্য-দর্শনে তাঁর হৈল প্রেমোদয়॥

[১] নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস, বহরমপুর সং (বঙ্গাব্দ—১৩২৮) পৃঃ ৭৬

তেঁহো দেউলিতে নিজ গৃহে লৈয়া গেলা।
আচার্য্যের পাদ-পদ্মে আত্ম সমর্পিলা॥
—ভক্তিরত্নাকর, ৭ম তরঙ্গ[1]

৫। দিব্য সিংহ—পদকর্তা গোবিন্দ দাসের একমাত্র পুত্র।

৬। কবিকর্ণপুর—কাঞ্চনপল্লী- (কাঁচড়াপাড়া) নিবাসী শিবানন্দ সেনের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন।

৭। বংশীদাস—শ্রীনিবাসের শিষ্য, জাতিতে ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট —মুর্শিদাবাদ জিলায় বুধুরির নিকট বাহাদুরপুর গ্রামে।

৮। শ্যামদাস চক্রবর্তী—শ্রীনিবাসের শিষ্য ও শ্যালক।

৯। রসিক মুরারি—শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য। নিবাস সুবর্ণ-রেখা নদী-তীরে 'রয়ণী'-গ্রাম। ইনি রাজপুত্র। পিতার নাম—রাজা অচ্যুতানন্দ।

১০। সূর্যদাস সরখেল—নিত্যানন্দের শ্বশুর। পূর্বে শালিগ্রামে বাস ছিল। পরে অম্বিকা-কালনায় আসিয়া বাস করেন।

১১। কৃষ্ণদাস সরখেল—সূর্যদাস সরখেলের ভ্রাতা।

১২। মাধব আচার্য—নিত্যানন্দের জামাতা এবং গঙ্গাদেবীর স্বামী।

১৩। রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়—নিত্যানন্দের শিষ্য।

১৪। মুরারি চৈতন্যদাস—নিত্যানন্দ-শাখা। প্রেমাবেশে ইনি প্রায় সব সময়েই বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া থাকিতেন—

মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্রগালে চড় মারে সর্প সনে খেলা॥
— চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১১শ পঃ[2]

১৫। শ্রীজীব পণ্ডিত—শ্রীহট্টের বুরুঙ্গ গ্রাম-নিবাসী রত্নগর্ভাচার্যের পুত্র।

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লো ১৩৩-১৩৪, পৃ: ৩৪৪

২ ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত (১৯৬৩), পৃ: ৫৫

১৬। নৃসিংহচৈতন্য—নিত্যানন্দ-শাখা। খেতরির উৎসবে ইনি ভক্তগণকে মাল্য-চন্দন প্রদানের ভার পাইয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর, ১০।১১৯)[১]।

১৭। কানাই—ঠাকুর কানাই বা শিশুকৃষ্ণ নামেও পরিচিত। ইনি পুরুষোত্তম এবং সদাশিব কবিরাজের পৌত্র। একমাত্র প্রেম-বিলাসেই আছে যে, ইনি খেতরির উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

১৮। গৌরাঙ্গদাস--নিত্যানন্দ-শাখা।

১৯। গৌরাঙ্গদাস—নরোত্তম-শাখা। মৃদঙ্গ-বাদ্যে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খেতরির উৎসবে ইনি করতাল-বাদ্য দ্বারা সকলের আনন্দ দান করেন—

শ্রীগৌরাঙ্গদাসাদিক মনের উল্লাসে।
বায় কাংস্য-তালাদি প্রভেদ—পরকাশে॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[২]

২০। নকড়ি—নিত্যানন্দ-শাখা।

২১। কৃষ্ণদাস— নিত্যানন্দ-শাখা।

২২। মীনকেতন রামদাস--নিত্যানন্দ-শাখা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে অহোরাত্র নাম-সংকীর্তনের নিমন্ত্রণ পাইয়া ইনি আসিলে সকল ভক্ত ইহার চরণবন্দনা করিলেন। কিন্তু তত্রত্য পূজারী গুণার্ণব মিশ্র ইহাকে সম্ভাষণ না করায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—

এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ।
বলরামে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৫[৩]

২৩। শঙ্কর—নিত্যানন্দ-শাখা।

২৪। কমলাকর পিপ্‌লাই—নিত্যানন্দ-শাখা ও পার্ষদ। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীপাট— হুগলী জিলার মাহেশ।

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), পৃ: ৪২২
২ ঐ শ্লো ৫৩০, পৃ: ৪২৩
৩ ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত (১৯৬৩), পৃ: ২০

২৫। **মনোহর**—নিত্যানন্দ-শাখা।

২৬। **মহীধর**—নিত্যানন্দ-শাখা।

২৭। **পরমেশ্বরদাস**—নিত্যানন্দ-শাখা। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম।

২৮। **বলরামদাস**—"প্রেম-বিলাস"-গ্রন্থের রচয়িতা নিত্যানন্দ-দাসের পূর্বনাম। ইনি জাহ্নবাদেবীর মন্ত্রশিষ্য।

২৯। **মুকুন্দ**—নিত্যানন্দ-শাখা।

৩০। **বৃন্দাবনদাস**—চৈতন্য-ভাগবতের গ্রন্থকার।

৩১। **অচ্যুত**—অদ্বৈত আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বৈষ্ণবসমাজে অচ্যুতের স্থান ছিল উচ্চে এবং সকল ক্ষেত্রে অচ্যুতের মতই বৈষ্ণবগণ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন -

অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।

—চৈতন্যচরিতামৃত. আদি ১২শ পঃ[১]

৩২। **গোপাল**—অদ্বৈত আচার্যের পুত্র।

৩৩। **কানু পণ্ডিত**—অদ্বৈত-শাখা। শ্রীপাট—শান্তিপুর।

৩৪। **নারায়ণদাস**—অদ্বৈত-শাখা।

৩৫। **বিষ্ণুদাস**—অদ্বৈত-শাখা।

৩৬। **কামদেব**—অদ্বৈত-শাখা

৩৭। **জনার্দন**—অদ্বৈত-শাখা।

৩৮। **বনমালী**—অদ্বৈত-শাখা।

৩৯। **পুরুষোত্তম**—অদ্বৈত-শাখা।

৪০। **শ্রীপতি**—নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীবাসের ভ্রাতা।

৪১। **শ্রীনিধি**—শ্রীবাসের অপর ভ্রাতা।

৪২। **কৃষ্ণদাস**—ব্রাহ্মণ, সুগায়ক।

পরম গায়ক কৃষ্ণদাস প্রেমাবেশে।

—নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস[২]

---

১ রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত (৪র্থ সং), পৃঃ ৬৪৭

২ বহরমপুর সং (১৩২৯), পৃঃ ৮৪

শ্রীপাট—আকাইহাট (কাটোয়া হইতে দেড় মাইলের মধ্যে)।

৪৩। নয়ন ভাস্কর—হালিসহর নিবাসী ভাস্কর।

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[1]

জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গোপীনাথ বিগ্রহের জন্য রাধিকার মূর্তি নির্মাণ করিতে ইহাকে আদেশ দেন—

নয়ন ভাস্করে শ্রীজাহ্নবা আজ্ঞা কৈলা।
তেঁহো শ্রীরাধিকা মূর্তি নির্মাণারম্ভিলা॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১১শ তরঙ্গ[2]

৪৪। শিবানন্দ—কবিকর্ণপূরের পিতা।

৪৫। রঘুনাথাচার্য—ভগবান আচার্যের (খঞ্জ) পুত্র।

৪৬। ভগবান কবিরাজ—শ্রীনিবাসের শিষ্য। খেতরির উৎসবে ইনি যদুনন্দন চক্রবর্তীর বাসাস্থানে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন—

শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তিবাসাস্থানে।
নিয়োজিলা যত্নে কবিরাজ ভগবানে॥

—নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস

৪৭। চৈতন্যদাস—নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা কুলিয়া পাহাড়পুর-নিবাসী বংশীবদনের পুত্র—

শ্রীবংশীবদন-পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস।

—নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস

৪৮। হৃদয় চৈতন্য—শ্যামানন্দের দীক্ষা-গুরু।

৪৯। যদুনন্দনদাস—বৈদ্য। শ্রীপাট—মালিহাটি।

৫০। রঘুনন্দন—বৈদ্য। শ্রীখণ্ড-নিবাসী মুকুন্দদাসের পুত্র।

৫১। বাণীনাথ বিপ্র—চৈতন্য-শাখা।

৫২। বল্লভ—বংশীবদন ঠাকুরের প্রপৌত্র।

৫৩। হরি আচার্য—গদাধর-শাখা।

৫৪। ভাগবত আচার্য—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"-রচয়িতা।

---

১ গৌড়ীয় মিশন সং (৯৪০): শ্লোক ৩৮১

২ ঐ শ্লোক ৭৮৮

৫৫। নর্তক গোপাল—নিত্যানন্দ-শাখা।

৫৬। জিতা মিত্র—গদাধর-শাখা।

৫৭। কাশীনাথ পণ্ডিত—শঙ্করারণ্য পণ্ডিত আচার্যের শাখা—

শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখায় লেখা।

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১০ম পঃ[১]

৫৮। উদ্ধব—শ্যামানন্দের শিষ্য।

৫৯। নয়নানন্দ মিশ্র—ব্রাহ্মণ। গদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র ও গদাধর পণ্ডিতের শাখা। মুর্শিদাবাদ জিলার কাঁদির নিকট ভরতপুর গ্রামে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া গদাধর তাঁহার সেবাভার ইঁহাব উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। নয়নানন্দের বংশধরগণ অদ্যাপি উক্তগ্রামে বাস করিতেছেন।

৬০। কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ—ব্রাহ্মণ। গদাধর-শাখা।

৬১। পুষ্পগোপাল—গদাধর-শাখা।

৬২। শ্রীদাস—হরিদাস আচার্যের পুত্র এবং শ্রীনিবাসের শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া।

৬৩। গোকুলদাস—হরিদাস আচার্যের অপর পুত্র।

৬৪। রামকৃষ্ণ চট্টরাজ—শ্রীনিবাসের শিষ্য। ইঁহার পুত্র গোপীজনবল্লভের সহিত শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার বিবাহ হয়।

৬৫। জ্ঞানদাস—জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ও বিখ্যাত পদ-কর্তা।

৬৬। গোকুলদাস—যাজিগ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া। নরোত্তমের শিষ্য। গোকুলদাসের সংগীতে ত্রিভুবন মোহিত হইত—

জয়শ্রীগোকুল ভক্তিরসের মূরতি।
যাঁর গানে নাহি বৈষ্ণবের দেহ স্মৃতি॥

—নরোত্তমবিলাস, ১২শ বিলাস[২]

১ ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত সং (১২৬৩), পৃঃ ৫০

২ বহরমপুর সং (১৩২১), পৃঃ ১৯৩

৬৭। দেবীদাস—নরোত্তমের শিষ্য। প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া ও মৃদঙ্গ-বাদক—

জয় শ্রীঠাকুর দেবীদাস কীর্ত্তনীয়া।
বৈষ্ণব উন্মত্ত যাঁর কীর্ত্তন শুনিয়া॥

—নরোত্তমবিলাস, ১২শ বিলাস[1]

৬৮। নৃসিংহ কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ইনি "অষ্টকবিরাজের" অন্যতম। নিবাস—ভরতপুর কাঞ্চনগড়িয়া।

৬৯। গোকুলানন্দ দাস—শ্রীনিবাসের শিষ্য। পূর্ব-নিবাস কড়ুই গ্রামে, পরে পঞ্চকোটের অন্তর্গত সেরগড়ে গিয়া ইনি বাস করেন।

৭০। কুমুদ চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ইঁহার পুত্র চৈতন্যের সহিত শ্রীনিবাসের মধ্যমা কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর বিবাহ হয়।

৭১। রামচরণ—শ্রীনিবাসের শ্যালক ও শিষ্য।

৭২। রূপ ঘটক—শ্রীনিবাসের শিষ্য। শ্রীপাট-যাজিগ্রাম। ইনি শ্রীনিবাসকে নিজের যাবতীয় সম্পত্তির অর্ধেক দিয়াছিলেন।

৭৩। গোপালদাস-শ্রীনিবাসের শিষ্য। নিবাস—কাঞ্চন-গড়িয়া।

৭৪। কর্ণপূর কবিরাজ—শ্রীনিবাসের শিষ্য। নিবাস বাহাদুর-পুর। ইনি খেতরির উৎসবে রঘুনাথ আচার্যাদির বাসাগৃহের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন—

রঘুনাথ আচার্য্যাদির বাসা ঘরে।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপূরে॥

—নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস

উপরে যে সব ভক্ত-বৈষ্ণবের নাম দেওয়া হইল, তাঁহারা ব্যতীত আরও বহু লোক এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, প্রেম-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে যে সব নাম উদ্ধৃত হইয়াছে,

১ বহরমপুর সং (১৩০৯), পৃঃ ১৭২

তাহাই এখানে দেওয়া হইল। উৎসবে সমবেত সব লোকের পূর্ণ তালিকা ইহা হইতে পারে না। বিশেষতঃ উৎসবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলের নাম সংগৃহীত হইয়াছিল কিনা, তাহা জানা যায় না। এইজন্য নরহরি অবশেষে বলিয়াছেন—

বন্দিগণ-আদি যত তার অন্ত নাই।
কি অদ্ভুত লোক-কোলাহল ঠাঁই ঠাঁই॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[১]

এই সব বৈষ্ণবগণ শুধু উৎসব দেখিতে আসেন নাই, সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী দ্রব্য-সামগ্রীও আনিয়াছিলেন।

যে সব সামগ্রী আনিলেন দেশ হৈতে।
তাহা রাখাইলা গৌরাঙ্গের ভাণ্ডারেতে॥

—নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস[২]

বলা যাইতে পারে, ইহাই বাঙলার প্রথম জাতীয় মহা-সম্মিলন। অবশ্য এই সময়ে আরও চারিটি বৈষ্ণব-সম্মিলন হইয়াছিল—একটি কাটোয়ায় গদাধরের তিরোভাব উপলক্ষে, অপরটি যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের নিজগৃহে, তৃতীয়টি শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে এবং চতুর্থটি কাঞ্চনগড়িয়ায় দ্বিজ হরিদাসের তিরোভাব উপলক্ষে। তবে খেতরির উৎসবের মতো এতবড় সম্মিলন আর কোথায়ও হয় নাই। অপর যে চারিটি উৎসব হইয়াছিল, তাহার একটি ব্যতীত (শ্রীনিবাস-গৃহের উৎসব) সবগুলিই হইতেছে তিরোভাব-তিথি-মহামহোৎসব এবং সেই উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব সম্মিলন। কিন্তু জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মহা-সম্মিলন, এই খেতরির উৎসবেই সর্বপ্রথম। বাঙালীর এই প্রথম জাতীয় সম্মিলনে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সকলেই সমাজের বৈষম্যের আবরণ ভেদ করিয়া একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়াছিলেন, যাহার ক্ষীণ-রেখাও এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা টানিতে অসমর্থ হইয়া শুধু মুখে

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৫৬৫, পৃঃ ৪২১

২ বহরমপুর সং (১৩২৯), পৃঃ ৭৯

বলিতেছি—"এক জাতি এক ধর্ম এক সিংহাসন।" সকল বৈষ্ণবের আগমন হইলে সন্তোষ দত্ত তাঁহাদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি নিয়োজিত করিয়া দেন। কবি নরহরির বর্ণনায় দেখা যায়—

গণসহ ঈশ্বরীর বাসা হইল যথা।
রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা তথা॥
রঘুনাথ আচার্য্যাদির বাসা ঘরে।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপূরে॥
শ্রীহৃদয়-চৈতন্যের বাসা যেইখানে।
তথা শ্যামানন্দে সমর্পিলা সাবধানে॥
শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে॥
আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লবীকান্ত তায়॥
শ্রীরঘুনন্দন গণসহ যে বাসাতে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে॥
বিপ্র কাশীনাথ জিতামিত্রাদিক ঘরে।
সমর্পিলা রামকৃষ্ণ কুমুদ আদিরে॥
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তিবাসাস্থানে।
নিয়োজিলা যত্নে কবিরাজ ভগবানে॥
আর যে যে বৈষ্ণবগণের বাসা যথা।
সমর্পিলা শ্রীগোপীরমণ আদি তথা॥
সর্ব্বত্র যাইয়া সবে করি পরিহার।
পৃথক পৃথক করি দিলেন ভাণ্ডার॥

—নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস[১]

---

১ বহরমপুর সং (১৩২১), পৃঃ ৮৬-৮৭

নরোত্তমবিলাসে দেখা যায় যে, সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইলে প্রাচীন প্রথানুসারে রাজা সন্তোষ দত্ত সকলকে "বরণ" করেন। এ বরণ মানে পরিধেয় বস্ত্র দান। বৈষ্ণবগণ বরণ গ্রহণ করিয়া আনন্দচিত্তে তাহা পরিধান করেন। কালীকান্ত বিশ্বাস বলেন—"ডোর-কৌপীন-সর্ব্বস্ব বিষয়-বৈরাগ্যশালী-প্রেমভক্তিদাতৃগণের এই পট্ট-বস্ত্র গ্রহণ ও পরিধান বৈষ্ণবধর্ম্মের অতঃপতন বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি" (রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ১৭২)।

এই মন্তব্য বিচারসঙ্গত নহে। বৈষ্ণব হইতে হইলেই যে ডোর-কৌপীন সম্বল করিতে হইবে তাহা যথার্থ নহে। গৃহিগণের মধ্যেও অনেক আচার্য আছেন। বিশেষতঃ নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু বিবাহাদি করিয়া সংসারী হইয়া ধর্মপালন করিতেই নির্দেশ দিয়াছিলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত বৈষ্ণবগণকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য পট্টবস্ত্র দ্বারা বরণ করেন। শুদ্ধ বস্ত্র হিসাবে সেই পট্টবস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলেই যে বৈষ্ণবধমের অধঃপতন সূচিত হইল, তাহা বলা যায় না।

যে মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপিত হয়, তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এই মহাধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হয়। ভক্তবৃন্দ সভাধিষ্ঠিত হওয়ার পর বৃন্দাবন হইতে যে সব গ্রন্থ প্রচারের জন্য গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া মোটামুটি আলোচনা করা হয়। ইহার পর সকলের সম্মতি লইয়া—

শ্রীরূপ গোস্বামী-কৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে॥

—নরোত্তমবিলাস, ৭ম বিলাস[১]

বৃন্দাবন গোস্বামিগণের বিধানানুযায়ী পূজার্চনা নির্বাহের ইহাই

১ বহরমপুর সং (১৩২৯), পৃঃ ৯১

প্রথম নিদর্শন। সকলের সম্মতিক্রমে বিগ্রহগুলি আনিয়া আসনে বসানো হয়। নামকরণ হয়—

গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[১]

নরোত্তম এই বিগ্রহের প্রণাম-মন্ত্রও রচনা করেন—

গৌরাঙ্গ! বল্লবীকান্ত! শ্রীকৃষ্ণ! ব্রজমোহন!
রাধারমণ! হে রাধে! রাধাকান্ত! নমোঽস্তুতে॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[২]

বিগ্রহ স্থাপনাদির পর সকল ভক্ত মালা-চন্দন গ্রহণ করিলেন। ইহার পর কিছু সময় শাস্ত্রাদির আলাপ-আলোচনা হইল। পরে অদ্বৈতাচার্য-তনয় অচ্যুত কীর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন—

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত-তনয়।
নরোত্তমে অতি-অনুগ্রহ বিস্তারয়॥
সকল মহান্ত প্রিয় নরোত্তম প্রতি।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে দিলেন অনুমতি॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[৩]

তখন নরোত্তম—

দীনপ্রায় দাঁড়াইয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
কৃপাদৃষ্টে চাহে নিজ পরিকর পানে॥

ঐ, ১০ম তরঙ্গ[৪]

নরোত্তম চরিত্রের এই দৃশ্যটি ছবির মতো আঁকিয়া রাখিবার মতো। কেননা নরোত্তম সেদিন কীর্তন-গানের দিগ্‌দর্শন করাইয়া বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিককে সকলের সম্মুখে তুলিয়া

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৪৮৩, পৃঃ ৪২১
২ ঐ , শ্লোক ৪৯৬, পৃঃ ৪২২
৩ ঐ , শ্লোক ৫২৪, পৃঃ ৪২৩
৪ ঐ , শ্লোক ৫২৬, পৃঃ ৪২৩

ধরিলেন। বস্তুতঃ নরোত্তম সেদিন যে সংগীতের রূপদান করিলেন, কীর্তনের ইতিহাসে তাহা লীলা কীর্তন বা রস-কীর্তন নামে খ্যাত।[১] অবশ্য ভাগবতে দেখা যায়, রাস-লীলা প্রসঙ্গে গোপীগণ কৃষ্ণ-লীলা গান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ-সহ নাম-কীর্তন এবং অন্তরঙ্গ-ভক্তবৃন্দ সহ-লীলা-কীর্তনে মগ্ন হইতেন—

অন্তরঙ্গ সনে লীলারস আস্বাদন।
বহিরঙ্গ লৈয়া হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥

—প্রেমদাসের বংশী-শিক্ষা[২]

ইহাতে দেখা যায়, নাম-কীর্তনের মতো লীলা-কীর্তনেরও জনক স্বয়ং-শ্রীচৈতন্য। অবশ্য তাঁহার পূর্বেও নাম-কীর্তনের চল ছিল।

---

১ নরোত্তম প্রবর্তিত এই ঢঙ-এর কীর্তনের নাম "গরাণহাটি"। ক্রমে এই ঢঙ-এ কিছু পরিবর্তন আনিয়া অর্থাৎ গায়ন-পদ্ধতিকে আরও সরল করিয়া সংগঠিত হয় "মনোহরশাহী" কীর্তন। এই রীতির প্রবর্তনের মূলে যে দুই ব্যক্তির নাম শোনা যায়, তাঁহারা হইলেন বংশীবদন ঠাকুর এবং বাবা আউলিয়া মনোহর দাস। ইহা ছাড়া "রেণেটি" ও "মন্দারিণী" নামে আরও দুইটি ঢঙ প্রবর্তিত হয়। শোনা যায়, সরকার সপ্তগ্রামের অন্তর্গত রাণীহাটি পরগণা (বর্তমানে বর্ধমান জিলায় সাতগাছিয়া থানার অন্তর্গত রেণেটি একটি ক্ষুদ্র গ্রাম) হইতে এই কীর্তন প্রসার লাভ করে। জনশ্রুতি এই যে, রেণেটির কাছে দেবীপুরের বিপ্রদাস ঘোষ এই ধারার উদ্ভাবক। মন্দারিণী ঢঙ-এর কীর্তন সরকার মান্দারণের অন্তর্গত উড়িষ্যা ঘেঁষা কোনও স্থান হইতে প্রবর্তিত হয় বলিয়া শোনা যায়। উল্লিখিত চারিটি ঠাট ছাড়া আরও একটি ঠাটের উল্লেখ দেখা যায়। ইহার নাম "ঝাড়খণ্ডী"। ঝাড়খণ্ডীর প্রবর্তন করেন সেরগড়-বাসী গোকুলানন্দ।

দ্রষ্টব্য—রাজ্যেশ্বর মিত্র—প্রাচীন বাঙলার সঙ্গীত (১ম সং), পৃঃ ৭৫-৭৬ ও "বীরভূমি", কার্তিক ১৩৩৩—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-রচিত প্রবন্ধ—"মনোহরশাহী কীর্তন"।

২ খগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক তদীয় "কীর্তন" গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১১

কেননা তাঁহার জন্ম-তিথি দোল-পূর্ণিমায় যখন চন্দ্র-গ্রহণ হয়, তখন দলে দলে লোক সঙ্কীর্তন করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে যায়—

সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি শ্রীহরিকীর্ত্তন॥

*

গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরিসঙ্কীর্ত্তন॥

—চৈতন্য-ভাগবত, আদি, ২ অঃ[১]

পূর্বে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথা পালার আকারে গাহিবার পদ্ধতি থাকিলেও শাস্ত্রীয় মার্গ-রীতিতে লীলা-কীর্তনের পালাবদ্ধ পদ্ধতি নরোত্তমই খেতরির উৎসবে প্রথম প্রদর্শন করেন। এই হিসাবে নরোত্তম কীর্তনের বিশেষ গায়ন পদ্ধতিতে নূতন রীতির প্রবর্তক। তাই দেখা যায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্তবামৃতলহরীতে নরোত্তমকে "স্বসৃষ্টগান প্রথিতায়তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়"[২] বলিয়া প্রণাম জানাইয়াছেন।

নরোত্তমের এই লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন রীতিমতো মার্গ পদ্ধতি অনুযায়ী গীত। প্রথমে নরোত্তমের অন্যতম পরিকর যাজিগ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া গোকুলদাস অনিবদ্ধ গীতক্রম আলাপ করেন,—অর্থাৎ শুধু "বর্ণন্যাস স্বরালাপের দ্বারা গীতের সূচনা করেন।[২] প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, গীতের দুইটি ভেদ—অনবিদ্ধ ও নিবদ্ধ।[৩] এই নিয়ম অনুসারেই গীত আরম্ভ করা হয়। আনবদ্ধ গীতক্রম আলাপের পর নরোত্তম কথা ও সুরের মিলন করিয়া নিবদ্ধ-গীতের পরিপাটি প্রচার করেন। বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে খোল ও করতাল ব্যতীত অন্য কোনও যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় না—

১ সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত (১৩৬৯), পৃঃ ১৯

২ ভক্তিরত্নাকর, গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), পৃঃ ৪৩২

৩ "অনিবদ্ধ, নিবদ্ধ—গীতের ভেদদ্বয়"। (ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ)

শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল, করতাল।
তাহে স্পর্শাইলা চন্দন পুষ্পমাল॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[১]

শ্রীখণ্ডের উৎসবে যে কীর্তন হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, ঝাঁজ ও খমকও (খঞ্জনি) ব্যবহৃত হইয়াছিল—

কিবা সে মধুর ঝাঁজ্-বাদ্যের চাতুরী।
বাজায় সুছন্দে চারু খমক, খঞ্জরী॥

—ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ[২]

উদ্দণ্ড কীর্তনে এইগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু মার্গ পদ্ধতি অনুযায়ী গীত উচ্চাঙ্গের সংগীতে এইগুলি ব্যবহারের সুযোগ কম। কাজেই নরোত্তম সেদিন পালাবদ্ধ পদাবলী কীর্তনের যে রূপ দেখাইলেন তাহা উচ্চাঙ্গ-সংগীতেরই পর্যায়ভুক্ত।

গীতারম্ভের প্রারম্ভে নরোত্তম গৌরচন্দ্রিকা গান করেন—

(শ্রীরাধিকা-ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[৩]

"গৌরচন্দ্রিকা" শব্দের আভিধানিক অর্থ—"ভূমিকা।"

"কীর্তন-গানের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন-গানের রসোপলব্ধির অনুষ্ঠান ভূমি।" শ্রীচৈতন্যের প্রেম-সাধনার ধারা প্রথমে স্মৃতিপটে জাগরিত করিয়া পরে তদুচিত লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন শুনিতে হয়। এইখানেই "গৌরচন্দ্রিকার" সার্থকতা। খেতরির মহোৎসবের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া কীর্তন আরম্ভ করা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান করিয়া রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কীর্তনের পদ্ধতি ইহার পূর্বে আর কোথায়ও দেখা যায় না।

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৫৪৪, পৃঃ ৪২৩
২ ঐ, শ্লোক ৬০৩, পৃঃ ৪০১
৩ ঐ, শ্লোক ৫৪৭, পৃঃ ৪২৩

গৌরগুণ-গীতারম্ভে অধৈর্য্য সকলে।

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[1]

(ইহা হইতে বোঝা যায় যে, ঠাকুর নরোত্তমই "গৌরচন্দ্রিকা" গাহিবার প্রথা প্রথম উদ্ভাবন করেন।) তর্কের খাতিরে যদি কেহ বলিতে চান যে, নরোত্তমের পূর্বেও পালা-কীর্তনের চল এদেশে ছিল, তাহা হইলেও বলা চলে যে, শাস্ত্রীয় মার্গ-রীতিকে কীর্তনে প্রয়োগ করিয়া উহার একটি বিশেষ গায়ন-পদ্ধতির রীতি নরোত্তমই প্রথম উদ্ভাবন করেন।

খেতরি-উৎসবের কীর্তনে প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক দেবীদাসের বাদ্যও সকলের মন হরণ করিয়াছিল—

হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুঁ।

—নরোত্তমবিলাস, ৭ম বিলাস

আর এই সঙ্গে নরোত্তমের কীর্তন যেন সকলের কর্ণে সুধাধারা প্রবাহিত করিয়া দেয়—

কেহ কহে—"ঐছে গীত-বাদ্যাদি না হয়।
না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয়"॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[2]

এই কীর্তনে চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি যোগদান করেন এবং সমবেত ভক্তবৃন্দ তাহা প্রত্যক্ষ করেন। মৃতগণকে কীর্তনানন্দে আনয়ন করা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীন কবিগণের নিকট তাহা অস্বাভাবিক ছিল না। "বেদব্যাস মহাভারতে বিধবা কুরু ললনাগণের চক্ষু ও চিত্তের সান্ত্বনার জন্য মৃত কুরু-বীরগণের ছায়া-মূর্তি আনিয়া, তাঁহাদিগকে ক্ষণেকের তরে দেখাইয়া আপনার অসাধারণ যোগবল ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।" কবি নরহরি সম্ভবতঃ বেদব্যাসের পদাঙ্কানুসরণে কীর্তনে চৈতন্য,

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৫৫০, পৃঃ ৪২৩
২ ঐ শ্লোক ৫৫৫, পৃঃ ৪২৩

অদ্বৈত প্রভৃতিকে উপস্থিত করাইয়া অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এক নবীন সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

(খেতরি-মহোৎসবে যে কীর্তন হইল তাহার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানে নৃত্যও কীর্তনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল—

চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকের নাহি অন্ত।
নাচে মহারঙ্গে সে সকল ভাগ্যবন্ত॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ[১]

নৃত্য, গীত ও বাদ্য —এই তিন লইয়াই সংগীত। এইজন্য ইহাকে "তৌর্যত্রিক[২] বলা হয়।" অপরাপর ভারতীয় সংগীতে গীত ও বাদ্যের সমন্বয় থাকে, আর না হয় নৃত্য ও বাদ্যের সমন্বয় থাকে। কিন্তু কীর্তনে থাকে এই তিনেরই সমাবেশ। অন্যত্র তাহা বিরল। শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্তনেও নৃত্যের সমাবেশ ছিল। খেতরি-মহোৎসব ব্যতীত কাটোয়া, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানে মহোৎসব উপলক্ষে যে কীর্তন হইয়াছিল, তাহাতেও ছিল নৃত্যের বিপুল সমাবেশ। বিশেষতঃ শ্রীখণ্ডের উৎসবে যে কীর্তন হয়, তাহাতে বীরভদ্রের নৃত্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। কিন্তু উচ্চাঙ্গের লীলা-কীর্তনে নৃত্যের সমাবেশ এই সর্বপ্রথম। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন—"এখন কিন্তু নৃত্য কীর্তনের সেরূপ অপরিহার্য অংশ নহে। নাম-সংকীর্তনে কখনও নৃত্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় বটে। কিন্তু উচ্চাঙ্গের লীলা-কীর্তনে প্রায়ই নৃত্যের সমাবেশ থাকে না। কীর্তনের মূল গায়ক কখনও কখনও গানের সঙ্গে, বাদ্যের ছন্দে নৃত্যের আভাস প্রকাশ করিলেও অন্য গায়কেরা এবং শ্রোতারা সে নৃত্যে যোগদান করিতেছেন এরূপ প্রায়ই দেখা যায় না।"

৮খেতরির মহাধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

১। বৈষ্ণব-ধর্ম ও বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রচার,

---

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৬০১, পৃঃ ৪২৫

২ খগেন্দ্রনাথ মিত্র—কীর্তন, পৃঃ ৩১

২। নব নব বিগ্রহ স্থাপন,

৩। তীর্থ-দর্শনাদি।

সভা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। পূর্বেই বলিয়াছি এই খেতরির উৎসবই বাঙলাদেশের প্রথম জাতীয় সম্মিলন। এই মহাধিবেশনের ফলে এদেশের শিক্ষা-দীক্ষার মোড় ঘুরিয়া যায়, জ্ঞান-ভক্তিকে জাতিগত সম্পত্তি না রাখিয়া, সমগ্র মানবজাতিকে সমানাধিকার দেয়। ইহারই ফলে বাঙালীর চোখ ফুটিয়াছে, ইহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে এই বাঙলাদেশে সর্ব-প্রথম ভারতীয় জাতীয় সম্মিলন আহূত হইয়াছে।

খেতরির উৎসব কোন্ সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্তও নির্ণীত হয় নাই। অনেকের মতে ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এই উৎসব হইযাছিল। ডক্টর সুকুমার সেন যথার্থই বলিয়াছেন —"এ তারিখের সমর্থনে কোন তথ্য নাই, প্রবল যুক্তিও নাই।" থাকিবেই বা কোথা হইতে? বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণ সন-তারিখ লইয়া কখনও মাথা ঘামান নাই। কাজেই কোন ঘটনার সময় সঠিকভাবে নির্ণয়ের উপকরণও নাই। তাই ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন যে, ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দের আরও বিশ-পঁচিশ বছর পরে এই উৎসব হওয়া সম্ভব। অপর্ণা দেবী ও সুধীর রায়ের মতে (কীর্তন-পদাবলী) ১৫৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎসব হয়। ইহাও অনুমান-সিদ্ধ। তবে একটি ঘটনা হইতে এই অনুষ্ঠানের কাল-নির্ণয় কিছুটা সম্ভবপর হয় বলিয়া মনে হয়। খেতরির উৎসবের পর জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি যখন বৃন্দাবনে উপনীত হন, দাসগোস্বামী তখন চলৎ-শক্তিহীন। রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে গিয়া জাহ্নবা ঠাকুরানীর দর্শনলাভের ক্ষমতা তাঁহার নাই। ইহা অবগত হইয়া জাহ্নবা ঠাকুরানী নিজেই রাধাকুণ্ডে গিয়া দাসগোস্বামীর সহিত দেখা করেন। দাসগোস্বামী তখন অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন—

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ১৬৭, পৃঃ ৪৩৭

অতিশয় ক্ষীণ তনু, তেজ সূর্য্য সম।

ভক্তিরত্নাকর, ১১শ তরঙ্গ[১]

এরূপ লোকের পক্ষে আর অধিক দিন জীবিত থাকা কষ্টকল্পনা। নবদ্বীপদাস রাধাকুণ্ডের ইতিহাসে দাসগোস্বামীর অপ্রকট কাল দেখাইয়াছেন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা সত্য হইলে বলিতে হয় যে, ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দেই খেতরির উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বছরই জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবন গমন করেন। এই অনুমান ব্যতীত এই মহাধিবেশনের কাল নির্ণয়ের আর কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নাই।

বৈষ্ণব-সাহিত্যেও ছিল নরোত্তমের বিশেষ অধিকার। ভক্তি-শাস্ত্রে তিনি অগাধ-পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনায় পাণ্ডিত্যের উগ্রতা কিছু ছিল না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও তিনি বাঙলায় রচিত চৈতন্যচরিতামৃতকেই সার করিয়াছিলেন, ভাগবতকে নয়। এই আদর্শই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা'য়—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভক্ত মাঝ যেঁহো কৈল চৈতন্য চরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা। তাহে না
জন্মিল মোর প্রীত।

বল্লভদাস নরোত্তমের রচনাবলীর একটি তালিকা দিয়াছেন—

চন্দ্রিকা পঞ্চম সার তিনমণি সারাৎসার
গুরু-শিষ্য-সংবাদ পটল।
ত্রিভুবনে অনুপাম প্রার্থনা গ্রন্থের নাম
হাট-পত্তন মধুর কেবল॥
রচিলা অসংখ্য পদ হৈয়াভাবে গদগদ
কবিত্বের সম্পদ সে সব।

"পাঁচ-চন্দ্রিকা" হইল প্রেম-ভক্তি চন্দ্রিকা, সাধন-ভক্তি চন্দ্রিকা, সাধ্য-প্রেম-চন্দ্রিকা, সিদ্ধ-ভক্তি চন্দ্রিকা বা রস-ভক্তি চন্দ্রিকা ও চমৎকার চন্দ্রিকা। "গুরু-শিষ্য-সংবাদ পটলে"র উপসনা পটল এবং আরও দুই-একটি "পটল" সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে

"চতুর্দ্দশ পটল"-গ্রন্থখানি নরোত্তমের রচনা হওয়া সম্ভব বলিয়া ডক্টর সুকুমার সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন। "তিনমণির" মধ্যে একমাত্র-"প্রেম চিন্তামণি" সংগৃহীত হইয়াছে এবং যে দুইটি নিবন্ধ পাওয়া যায় নাই তাহাদের নাম "চন্দ্রমণি" ও "সূর্য্যমণি" বলিয়া জানা যায়। নরোত্তমের "হাট পত্তন" রচনাটি বাস্তবিকই মধুর এবং বৈষ্ণবের নিত্য-পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এতদ্ব্যতীত নরোত্তমের অনেক প্রার্থনার পদ আছে। এগুলি অত্যন্ত সরস ও স্নিগ্ধ রচনা।

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের কাছেই নরোত্তমের শিক্ষা-দীক্ষা। সহজিয়া বা বাউলগণের আচার-বিচার তাঁহার মধ্যে থাকার কথা নহে। তবু এই সব সম্প্রদায়ের সাধকগণ নরোত্তমকে তাঁহাদের গুরুস্থানীয় বলিয়া সম্মান করেন। এমন কি, ইহাদের অনেক রচনাও নরোত্তমের নামে চলিয়া আসিতেছে। এগুলি আকারেও নিতান্ত ছোট। এগুলির নাম[১]—

'দেহ-কড়চ,' 'স্মরণ-মঙ্গল,' 'স্বরূপ কল্পতরু,' 'ছয়তত্ত্ব-মঞ্জরী' বা 'ছয় তত্ত্ববিলাস,' 'বস্তুতত্ত্ব' বা 'বস্তুতত্ত্বসার', 'ভজন নির্দ্দেশ,' 'আশ্রয় নির্ণয়' বা 'আশ্রয়তত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব' বা 'নব-রাধাতত্ত্ব', 'রাগ-মালা', 'ভক্তি-লতাবলী', 'ভক্তি-সারাৎসার', 'প্রেম-বিলাস', 'বৈষ্ণবামৃত', 'প্রেম-মদামৃত', 'মঙ্গলারতি' প্রভৃতি।

নরোত্তমের রচিত বলিয়া কথিত আর একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম—'রাধিকার মানভঙ্গ'। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৩০৭ বঙ্গাব্দে "বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাবলী"র যে সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এখানি দেখা যায়। চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রাম নিবাসী শশিকুমার নন্দীর নিকট হইতে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থের শেষে লিপিকারের মন্তব্য

"ইতি শ্রীমতী রাধিকার মানভঙ্গ পুস্তক সমাপ্ত হইল।

যথা দৃষ্টং তথা লিখিত ॥ লেখকের দোষ নাস্তি ॥ সন ১২০৯

১ ডক্টর সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৩৭ ৮

সাল, তারিখ ২০ ভাদ্র, মঙ্গলবার, এক প্রহর বেলা থাকিতে মোকাম মিরেশ্বরাই পশ্চিমদ্বারী ঘরের মাজের কুঠরিতে এই পুথি শ্রীযুত ফকীরচাঁদ চৌধুরীর লেখক শ্রীযুত রামতনু দেবশর্ম্মণঃ॥ সাং বেলপুখরিআর উত্তরপাড়ায়॥ শ্রীকৃষ্ণ॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পাণ্ডুলিপির মালিক ছিলেন জনৈক ফকীরচাঁদ চৌধুরী এবং পরে ইহা শশিকুমার নন্দীর হস্তগত হয়। মৌলবী আব্দুল করিমের মতে গ্রন্থখানি নরোত্তম দাসের রচিত।

এই পুস্তকের বানান-পদ্ধতি সর্বত্র একরূপ নহে—জায়গায় জায়গায় 'অ' বা 'আ' দিয়াও লেখা হইয়াছে। যথা—য়্যামি (আমি), য়্যাকুল (আকুল), ইত্যাদি। অনেক ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি শব্দেই 'য'-ফলার সংযোগ দেখা যায়। যেমন—বিন্যা, শুনিয়্যা, কবিল্যা, ললিতা্য, সাত্যা ইত্যাদি। গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই "কথা", "যেই", "আমি", "আসি", "দ্রব্য" প্রভৃতি সাধারণ শব্দগুলি "কতা," "জেই," "যামী," "য়াসী" বা "আসী," "দর্ব্ব" ইত্যাদি রূপে লিখিত আছে।

ইহা ছাড়া রচনাটি গ্রাম্য-রীতিতে কৃষ্ণ-যাত্রার অনুরূপ। মাঝে মাঝে নরোত্তম-রচিত দুই একটি গীতি-কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পালার আকারে সাজানো। বিশেষতঃ নরোত্তমের সব রচনার পশ্চাতে যে আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর প্রভাব দেখা যায়, এই রচনার কোথায়ও সে ভাব পরিলক্ষিত হয় না। কাজেই গ্রন্থখানি নরোত্তমের রচনা বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

নরোত্তমের অনেক ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিলেন। এইরূপ প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। রায় বসন্ত—ভক্তিরত্নাকরে (১ম তরঙ্গ) আছে—

নরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত।
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥

ইহা হইতে জানা যায়, রায় বসন্ত শুধু ব্রাহ্মণ ছিলেন না, একজন

উচ্চ-শ্রেণীর কবিও ছিলেন। পদকল্পতরুতে ইহার রচিত পদ আছে। রায় বসন্ত বৃন্দাবনে গেলে শ্রীজীব তাঁহার হাতে শ্রীনিবাসকে এক পত্র পাঠান। পত্রখানি ভক্তিরত্নাকরে (১৪শ তরঙ্গ, ১নং পত্র) উদ্ধৃত আছে।

২। **গোপীরমণ-চক্রবর্ত্তী**—নরোত্তমবিলাসে (১২শ বিলাস) আছে—

জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ।
গণসহ গৌরচন্দ্র যাঁর প্রাণধন।

খেতরির উৎসবে ইনি উপস্থিত থাকিয়া বৈষ্ণবগণের বাসার তত্ত্বধান করেন—

আর যে যে বৈষ্ণবগণের বাসা যথা।
সমর্পিলা গোপীরমণ-আদি তথা॥

নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস

৩। **রামকৃষ্ণ আচার্য** -রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ —"রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র তিহো পণ্ডিত প্রধান" (প্রেমবিলাস-২০ বিলাস)।

৪। **রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তী** (বা **রূপচন্দ্র সরস্বতী**)

প্রেম-বিলাস (১৯শ বিলাস) হইতে জানা যায় যে, ইহার পিতার নাম লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী। ইনি পক্বপল্লীর রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই রাজার সভাসদ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে রূপনারায়ণ ছাড়া আরও বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। ইহাদের নাম যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, নিবারণ বিদ্যাবাগীশ ও দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ এবং সকলেই নরোত্তমের শিষ্য। প্রেম-বিলাসে (১৯শ বিলাস) ইহাদের বিবরণ আছে।

৫। **রূপনারায়ণ**

খেতরি-নিবাসী রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

৬। **রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

পূর্বে নবদ্বীপে নিবাস ছিল —

জয় রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দয়াবান্।
অতি পূর্ব্বে নবদ্বীপে যাঁর অবস্থান॥

—নরোত্তমবিলাস, ১২শ বিলাস

৭। **শংকর ভট্টাচার্য**—

নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকট নৈহাটিতে।

৮। **গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী**—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—মুর্শিদাবাদ জিলার বালুচরের নিকট গম্ভীলা গ্রামে।

৯-১০। **শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও হরিনাথ চক্রবর্ত্তী**—পূর্বে ইহারা চাঁদরায়ের দলে ডাকাতি করিতেন। নরোত্তম ঠাকুরের কৃপায় পরমবৈষ্ণব হন—

পূর্ব্বে তাঁরা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল।
চাদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥
ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তাঁর মর্ম্ম।
সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি' পূর্ব্ব কর্ম্ম॥

—প্রেম-বিলাস, ১৯শ বিলাস

১১। **মুকুট মৈত্রেয়**—ইহার বাড়া-ছিল ফরিদপুরে—

আর শিষ্য মুকুট মৈত্রেয় সর্ব্ব লোকে জানে।
ফরিদপুর বাড়ী তাঁর কহে সর্ব্বজনে॥

-প্রেম-বিলাস, ২০শ বিলাস

শ্যামানন্দ

বাঙলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও সংরক্ষণে অগ্রণী যেমন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম, উড়িষ্যায় সেইরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে ব্রতী হন শ্যামানন্দ। পূর্বেই বলিয়াছি ইহারা তিনজনেই শ্রীজীব গোস্বামীর ছাত্র এবং শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনজনেই এক সঙ্গে দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, রসিকমঙ্গল, অভিরাম-লীলামৃত, শ্যামানন্দ-প্রকাশ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থে শ্যামানন্দের জীবন-কাহিনীর উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া শ্যামানন্দের অন্যতম প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ "শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ শতকম্" নামে একখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অন্য ধরণের। গুরুদেব তত্ত্বতঃ কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হইয়াও লীলায় যে কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, তাহাই তিনি এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

শ্যামানন্দের পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল এবং মাতার নাম দুরিকা। জাতি সদ্‌গোপ। বর্তমান মেদিনীপুর জিলার ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে ইহাদের পূর্ব-নিবাস ছিল। সেইখানেই শ্যামানন্দের জন্ম—

ধারেন্দা-বাহাদুরপুরেতে পূর্ব্ব-স্থিতি।
শিষ্টলোকে কহে শ্যামানন্দ-জন্ম তথি॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ[১]

পরে ইহারা উড়িষ্যার দণ্ডেশ্বর গ্রামে গিয়া বসে করেন। শ্যামানন্দের আরও ভ্রাতা-ভগ্নী ছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই মারা যান। শেষে শ্যামানন্দের জন্ম হয়। মাতা-পিতা-অনেক শোক-তাপ সহ্য করিয়া শেষে এই পুত্র লাভ করেন বলিয়া প্রথমে ইহার নাম রাখা হয়-"দুঃখী"—

মাতা-পিতা-দুঃসহ পালন করিল।
এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হৈল॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ[২]

যথা সময়ে তাঁহার অন্নপ্রাশন এবং চূড়াকরণ হইল এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণাদির পাঠ শেষ করিলেন।

বাল্য হইতেই শ্যামানন্দ ছিলেন ধর্মানুরাগী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব আরও প্রকট হইয়া দেখা দেয়। পুত্রের এইরূপ

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৩১৪, পৃ: ১৬
২ ঐ শ্লোক ৩১৯, পৃ: ১৬

ভাবান্তর দেখিয়া মাতা-পিতা তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের আদেশ দেন। তদনুসারে তিনি অম্বিকা-কালনায় আগমন করেন। অম্বিকা-কালনায় তখন বাণীনাথের পুত্র এবং গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়চৈতন্য (হৃদয়ানন্দ) থাকিতেন। নিত্যানন্দের শ্বশুর শালিগ্রাম-নিবাসী সূর্যদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত হৃদয়-চৈতন্যকে গদাধর পণ্ডিতের নিকট প্রার্থনা করিয়া অম্বিকা-কালনায় গৌর-নিত্যানন্দের সেবায় নিয়োগ করেন। এই হৃদয়চৈতন্যের নিকট শ্যামানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি শ্যামানন্দের তখন নাম ছিল "দুঃখী"। হৃদয়চৈতন্য দুঃখীকে দীক্ষা দিয়া নাম রাখিলেন— "কৃষ্ণদাস"। ইঙ্গিতে ইহাও জানাইলেন যে, "শ্যামানন্দ নাম ব্যক্ত হবে বৃন্দাবনে"।[১]

কিছুদিন পরে গুরুর আদেশে দুঃখী কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া শ্রীজীবের নিকট তিনি ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় শ্রীনিবাস এবং নরোত্তমের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে দুঃখী কৃষ্ণদাসের সাধন-ভজনের ফলে তাঁহার উপর শ্যামসুন্দরের কৃপা হয়। তখন হইতে তাঁহার নাম হইল—"শ্যামানন্দ"—

> শ্যামসুন্দরের মহানন্দ জন্মাইল।
> 'শ্যামানন্দ' নাম পুনঃ বৃন্দাবনে হইল॥
>
> —ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ[২]

কথিত আছে—বৃন্দাবনে রাস-মণ্ডল পরিষ্কার করিতে গিয়া শ্যামানন্দ রাধার চরণ-চ্যুত নূপুর প্রাপ্ত হন। রাধা তাঁহার সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নূপুর-সদৃশ তিলক দান করেন এবং তখন হইতে তাঁহার নামও হয় "শ্যামানন্দ"। শ্যামাকে (রাধাকে) আনন্দ দান করেন বলিয়াই নাম হইল—শ্যামানন্দ।

১ ভক্তিরত্নাকর, গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৩৫২, পৃঃ ১৭

২ ঐ শ্লোক ৪০১, পৃঃ ১৮

অনুরাগবল্লীতে দেখা যায়, শ্রীজীব গোস্বামীই এই নাম রাখিয়াছিলেন—

প্রথমে আছিল নাম দুঃখিনী-কৃষ্ণদাস।
তৎ পশ্চাৎ এই নাম হইল প্রকাশ॥
শ্যামল সুন্দর তনু মগ্ন প্রেম সুখে।
জানিয়া রাখিল নাম শ্রীজীব শ্রীমুখে॥

—৬ষ্ঠ মঞ্জরী[১]

বৃন্দাবন হইতে উড়িষ্যায় ফিরিয়া শ্যামানন্দ ধর্ম-প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার এই কাজে দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন রসিকানন্দ বা রসিকমুরারি। ইনি ছিলেন রাজপুত্র। পিতার নাম রাজা অচ্যুতানন্দ। জন্মস্থান—সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রয়নী গ্রামে। প্রেম-বিলাসে (২০ বিলাস) আছে—

শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারি।
যার যশোগুণ গায় উৎকল দেশ ভরি॥
শ্যামানন্দের প্রিয় শিষ্য দুই মহাশয়।
সুবর্ণরেখা-নদীতীরে রয়নী আলয়॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রসিকানন্দ এবং মুরারি দুই ব্যক্তি। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে আছে—

রয়নী গ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুত-তনয়।
শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীমুরারি-নাম-দ্বয়॥
'রসিক-মুরারি' নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ অল্পকাল হৈতে॥

—১৫শ তরঙ্গ[২]

ইহাতে দেখা গেল, রসিকানন্দ এবং মুরারি একই ব্যক্তি।

এখন দুই মতের কোন্‌টি ঠিক, তাহা স্থির করিতে হইবে।

১ মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত (৩য় সং), পৃঃ ৪০

২ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ২৭-২৮, পৃঃ ৬৪৩

রসিকানন্দের একজন সাক্ষাৎ শিষ্য গোপীজনবল্লভ দাস[১] স্বীয় গুরুদেবের একখানি জীবনী লিখিয়াছেন। "রসিকমঙ্গল" নামে এই চরিত-গ্রন্থে (৫ম লহরী) দেখা যায়, রাজা অচ্যুত দ্বিজ দৈবজ্ঞ আনিয়া পুত্রের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করান। সেই সময় তাঁহারা—

"রাশি বিশাখা তুল, নাম শ্রীরসিক মূল, জাতিপত্রে লেখিলা সত্বর।
ব্রাহ্মণ-দৈবজ্ঞগণ, গণিয়া হরষ মন, বলে কোষ্ঠী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ‹র॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ পুত্রের নাম রাখেন—"রসিক"। রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া কহিলেন

"শ্রীরসিক মূল নাম, জাত কোষ্ঠী পরমাণ, বিদিত হেবে যে ভুবনে।
মোর মনে অভিলাষ, পুরাও আমার আশ, মুরারি বলয়ে সর্ব্বজনে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে অনুপম, দাস মুরারি নাম, ডাকে যেন সকল ভুবনে।
দ্বিজগণ শুনি বাণী, এই নাম সত্য মানি, গেলা সবে যে যার
ভবনে॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজা অচ্যুতের একই পুত্রের নাম মুরারি এবং রসিক, যিনি উত্তরকালে রসিকানন্দ বা রসিকমুরারি নামে খ্যাত হন। কাজেই এক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শিষ্যের উক্তিই প্রামাণিক বলিয়া ধরিতে হইবে।

শ্যামানন্দের নিকট রসিকমুরারির দীক্ষাগ্রহণও এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এক দিবস সুবর্ণরেখা নদীর সন্নিধানে ঘাটশীলা গ্রামে নির্জনে বসিয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে—

হইল আকাশ-বাণী—চিন্তা না করিবে।
এথায় শ্রীশ্যামানন্দ স্থানে শিষ্য হবে॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১৫শ তরঙ্গ[২]

পরদিন প্রাতে শ্যামানন্দের সহিত রসিকমুরারির সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর শ্যামানন্দের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্যামানন্দ

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন, পৃঃ ৪৯

২ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৩৩, পৃঃ ৬৪৩

গোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পরে সেই সেবা-ভার রসিকমুরারির হস্তে সমর্পণ করেন। বাঙলা-উড়িষ্যার সীমান্তে ও ঝাড়খণ্ডে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার প্রধানতঃ শ্যামানন্দ এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ কর্তৃকই সম্পাদিত হয়। রসিকমুরারি দীক্ষা গ্রহণের পর শ্যামানন্দকে নিজ বাসস্থলী রয়নীতে লইয়া গিয়া কীর্তনানন্দে মগ্ন হন। শ্যামানন্দ অনেক লোককে শিষ্য করেন। তাঁহার অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে ভক্তিরত্নাকরে কয়েকজনের নাম দেখা যায়—

রাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, মনোহর।
চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর॥
উদ্ধব, অক্রুর, মধুবন, শ্রীগোবিন্দ।
জগন্নাথ, গদাধর, শ্রীআনন্দানন্দ॥
শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ সঙ্গে।
সদাভাসে সংকীর্তন-সুখের তরঙ্গে॥

— ১৫শ তরঙ্গ[১]

শ্যামানন্দ বাঙলায় কিছু স্তব, পদাবলী ও ছোট ছোট সাধন-নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত "দুঃখী কৃষ্ণদাস" ভণিতায় অন্ততঃ তিনটি পদ এবং "দীন কৃষ্ণদাস" ভণিতায় কয়েকটি পদ ইঁহার রচনা হইতে পারে বলিয়া ডক্টর সুকুমার সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্যামানন্দের নামে যে সব সাধন-নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতেছে—"উপাসনা সার" বা "উপাসনা সার-সংগ্রহ", "ভাবমালা" "অদ্বৈত-তত্ত্ব" ও "বৃন্দাবন পরিক্রমা"।[২]

উড়িষ্যায় শ্যামানন্দের প্রচারের ফলে কবি-সাহিত্যিকও তাঁহাদের

১ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ৬০-৬৫, পৃঃ ৬৪৪

২ ডক্টর সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৪৪ ৪৫

রচনায় নব-প্রেরণা লাভ করেন। তাঁহারা বৈষ্ণব ভাব-ধারায় ভাবিত হইয়া কাব্য রচনায় যত্নপর হন। ফলে শ্যামানন্দ ও তাঁহার অনুচর-বৃন্দের কার্যধারা আরও সু-প্রসারিত হইতে সুযোগ পায়। এইসব বৈষ্ণব কবিগণের নাম—অচ্যুতানন্দ, বলরাম, জগন্নাথ, অনন্ত, যশোবন্ত এবং চৈতন্য। ইঁহারা "ছয় দাস" নামে পরিচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

যুগ-সমীক্ষা

পূর্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য খেতরির মহোৎসবে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুযায়ী সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যবস্থা হয়।

কয়েকটি স্থানকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে বিষ্ণুপুর এবং খেতরি। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর এবং খেতরির রাজা সন্তোষ দত্ত এই কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইহা ছাড়া ময়ূরভঞ্জ-রাজ, পঞ্চকোট-রাজ, পাইকপাড়া-রাজ প্রভৃতির সহায়তাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকমুরারির চেষ্টায় উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয়ে আসেন। প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানাও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে সহায়তা করেন। তিনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

পূর্বে বৃন্দাবনে গোবিন্দ এবং মদনমোহন বিগ্রহদ্বয়ের পার্শ্বে রাধা-মূর্তি ছিল না। সেজন্য পুরুষোত্তম জানা দুইটি রাধা-মূর্তি উৎকল হইতে বৃন্দাবনে পাঠান কিন্তু মূর্তি দুইটি বৃন্দাবনে পৌঁছিলে জানা যায় যে, ইহাদের একটি রাধা-মূর্তি এবং অপরটি ললিতার মূর্তি। এই রাধা-মূর্তি মদনমোহন মন্দিরে রাখা হইল; কিন্তু গোবিন্দ-মন্দিরের জন্য আর একটি রাধা-মূর্তির অভাব থাকিয়া যায়। পরে স্বপ্নাবেশে রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া জগন্নাথদেবের চক্রবেড়ে রক্ষিত রাধা-বিগ্রহও তিনি গোবিন্দ-মন্দিরের জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।[১]

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এই রাধা-বিগ্রহ পূর্বে বৃন্দাবনেই ছিলেন।

১ ভক্তিরত্নাকর— ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, (গৌড়ীয় মিশন সং, ১৯৬০) পৃঃ ৩২২-২৪

কোন ভক্ত এক সময়ে ইহাকে উৎকল দেশে লইয়া আসেন। পরে উৎকলের রাধানগর গ্রাম-নিবাসী বৃহদ্ভানু নামে এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ এই বিগ্রহ নিজ গৃহে আনিয়া সেবা করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উৎকলের কোন ভক্ত-রাজা এই শ্রীমূর্তিকে আনিয়া জগন্নাথদেবের চক্রবেড়ের মধ্যে পরম যত্নে রক্ষা করেন। পরে ইনি লক্ষ্মী নামে সর্বত্র রাষ্ট্র হন -

চক্রবেড়ে বহুদিন অতীত হইল।
"ইঁহ লক্ষ্মী"—এই কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥[১]

পুরুষোত্তম জানার স্বপ্ন দর্শনের পর ইঁহাকে রাধা-বিগ্রহ বলিয়া জানা যায়।

বাঙলাদেশের প্রায় সর্বত্রই নব-অনুরাগে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের সাড়া পড়িয়া যায়। ভাগীরথীর একপারে বরাহনগর, আড়িয়াদহ, পাণিহাটি, সুখচর, খড়দহ, কাঞ্চনপল্লী, কুমারহট্ট এবং অপরপারে, মাহেশ, আকনা, বিষখালি (বড়া আটপুর), জিরাট, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থানে বহু ভক্তের বাস ছিল। তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে সহায়তা করিতেন।

বর্ধমান জিলা ছিল বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের একটা পীঠস্থান। এই জিলার সদর মহকুমার অধীন জামালপুর থানার অন্তর্গত কুলীনগ্রাম-বাসিগণ পূর্ব হইতেই বৈষ্ণবধর্মে আস্থাবান ছিলেন। পরমবৈষ্ণব মালাধর বসুর বাড়ী ছিল এই গ্রামে। হরিদাস ঠাকুরও এখানে আসিয়া একটি আশ্রম স্থাপন করেন। কাজেই পূর্ব হইতেই এই স্থান একটি বৈষ্ণব-তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। তাই দেখা যায়, কবিরাজ গোস্বামী যেরূপ পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে কুলীনগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এই স্থানের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়—

ভক্তিরত্নাকর,—৬ষ্ঠ তরঙ্গ, শ্লোক—১০২ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), পৃঃ ৩২৪

কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥[১]

মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

…… কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥[২]

কাজেই কুলীনগ্রামও ছিল বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র। ইহা ছাড়া কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ, কুলাই প্রভৃতি স্থানেও বহু ভক্তের বাস ছিল এবং ধর্ম প্রচারে তাঁহারা সহায়তা করিতেন। বীরভূম জিলার ময়নাডাল, মঙ্গলডিহি প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনার কেন্দ্র ছিল। ফলে বৈষ্ণবধর্মও প্রচারিত হইবার সুযোগ পাইত।

ইহা ছাড়া আরও অনেক রাজন্যবর্গ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরগণের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরমবৈষ্ণব হন। দিনাজপুর-রাজও বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করেন। কাছাড়ের রাজা বীর দর্পনারায়ণ বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয়ে আসেন এবং ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দশাবতার মূর্তি চিহ্নিত করিয়া এক শঙ্খ নির্মাণ করান। ত্রিপুরা-রাজ অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরমাণিক্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন (১৬১১-১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি অনেক মন্দির নির্মাণ করান। ইহা হইতে বুঝা যায়, বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রসারণে তিনি যত্নপর ছিলেন।

রত্নমাণিক্যের সময়ে (১ ১২ খ্রীঃ কুমিল্লার প্রসিদ্ধ '১৭ রত্ন' মন্দির নির্মিত হয়। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীধর স্বামী, সনাতন, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ

১ চৈতন্যচরিতামৃত, আদি — ১০ম পরিচ্ছেদ ডক্টর সুকুমার সেন-সম্পাদিত (সাহিত্য অকাদেমী সংস্করণ, ১৯৬৩) পৃঃ ৪৯

২ চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১০ম পরিচ্ছেদ ড. সুকুমার সেন-সম্পাদিত (সাহিত্য অকাদেমী সংস্করণ, ১৯৬৩) পৃঃ ৪৯

চক্রবর্তী প্রমুখ আচার্যগণের টীকা সমেত ভাগবত মুদ্রিত করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করেন। রাধাকিশোরমাণিক্য ও তাঁহার একান্ত-সচিব রাধারমণ ঘোষ যথেষ্ট অর্থব্যয়ে বহরমপুরে "রাধারমণ যন্ত্র" স্থাপন করিয়া বহু অপ্রকাশিত এবং দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দ্বারা প্রকাশের সুবিধা করিয়া দেন।

মণিপুরের ৪৮নং রাজা পামহেইবার (১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ) বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। এই মণিপুর রাজ্যের অধিবাসিগণ এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী।[১]

বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ-পরিকরগণের সহিত নীলাচলে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ 'নাটকগীতি' আস্বাদন করিতেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥[২]

ইহা হইতে বুঝা যায়, জয়দেব আর শ্রীচৈতন্যের মাঝখানে দুইজন পদকর্তা—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। ইহাদের পদাবলী প্রাক্-চৈতন্য যুগের এবং ইহা ছাড়া অন্যান্য শত শত পদ-কর্তার পদাবলী চৈতন্যোত্তর যুগের।

এই যুগে পদকর্তাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি ছিল গোবিন্দদাসের। তবে জাহ্নবাদেবীর শিষ্য জ্ঞানদাসের খ্যাতিও কম ছিল না।

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পরিশিষ্ট—পৃঃ ২৬-২৭

২ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২য় পরিচ্ছেদ—ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত সাহিত্য অকাদেমী সংস্করণ (১৯৬৩) পৃঃ ১১৯

গোবিন্দদাস পদ রচনা করিয়া বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাইতেন। শ্রীজীব ঐ সব পদাবলী আস্বাদন করিয়া অনুমোদন করিলে গৌড়মণ্ডলে তাহার প্রচার হইত। কবি খ্যাতির জন্য গোবিন্দদাস বৃন্দাবন হইতে "কবিরাজ" উপাধি লাভ করেন।[১] বঙ্গ-সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসেও এই সময়কে সুবর্ণ-যুগ বলা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কাশীরামদাস প্রভৃতি কবিগণ এই সময়ে তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করেন। "মুকুন্দরাম চণ্ডীর গান করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যকে হরির অবতার এবং প্রেমভক্তি কল্পতরু, অখিল জীবের গুরুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবতত্ত্বের ছাপ অল্পবিস্তর সর্বত্রই প্রকটিত হইয়াছিল। এই যুগে গোবিন্দদাস নামে আর একজন বাঙালী কবি ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ছিল চট্টগ্রামে এবং তাঁহার রচিত কাব্যের নাম 'কালিকামঙ্গল'। তাঁহার রচনার মধ্যে কোন কোনটি ব্রজবুলিতে লেখারও নিদর্শন পাওয়া যায়।[২] সুতরাং বৈষ্ণব-কবি উদ্ভাবিত 'ব্রজবুলি'ও যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বলা চলে।

এই যুগ বৈষ্ণব-কবিরই যুগ। কাজেই তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। কয়েকজনের নাম এখানে উদ্ধৃত হইল -রায় শেখর, রামচন্দ্র কবিরাজ, বীর হাম্বীর, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নৃসিংহ, গোপাল দাস, গতিগোবিন্দ, গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র দিব্য সিংহ, যদুনন্দন, রায় বসন্ত, বল্লভদাস, উদ্ধবদাস প্রভৃতি। এই যুগের আর একজন বৈষ্ণব কবির নাম বলরামদাস। কবিত্বের বিচারে ইনি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের সহিত তুলনীয়। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দও কবি ছিলেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে। নরোত্তমের 'প্রার্থনা'র পদ 'প্রাণ নিঙড়ানো আর্তিতে ভরপূর'। বঙ্গ-সাহিত্যের এ উন্নতির দিনেও এরূপ রচনা অন্যত্র বিরল।

১ ভক্তিরত্নাকর—১১শ তরঙ্গ, গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৩০) পৃঃ ৪৩৬

২ ডক্টর সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; অপরার্ধ পৃঃ ৪৭৪

চৈতন্যোত্তর যুগে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই অধিকাংশ পদাবলী রচিত হয়। তবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পদাবলী রচনা চলিয়াছিল। একাধারে পদকর্তা ও পদ-সংগ্রাহক রাধামোহন ও বৈষ্ণবদাস অষ্টাদশ শতকের পদকর্তা। ইহার পরেও কিছু কিছু পদাবলী রচিত হয়। উনবিংশ শতকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী কিছু কিছু পদাবলী রচনা করেন এবং একালে রবীন্দ্রনাথ ছদ্মনামে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করেন।

মঞ্জরী

অভিলষিত বস্তুতে স্বাভাবিক যে প্রেমময় তৃষ্ণা, তাহার নাম রাগ। সেই রাগময়ী ভক্তিই হইল রাগাত্মিকা ভক্তি। ব্রজবাসিগণের ভিতরে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা যে রাগাত্মিকা ভক্তি,—তাহার অনুগতা ভক্তিই রাগানুগা নামে খ্যাত।[১] কিন্তু একমাত্র রাধা-প্রেমই হইল মধুর রসের রাগাত্মক প্রেম। তাহা এক রাধা ব্যতীত আর কোথায়ও সম্ভবপর নয়। এই রাধারই কায়ব্যূহ-স্বরূপ হইলেন সখীগণ[২] এবং সখীগণের অনুগতা সেবাদাসী হইলেন মঞ্জরীগণ। মঞ্জরীগণও গোলকের নিত্য পরিকর এবং তাঁহাদের অনুগভাবে সেবা ও লীলা আস্বাদনই হইল জীবের শ্রেষ্ঠ কাম্য। মঞ্জরীগণের কৃপা হইলে তবেই রাধা-কৃষ্ণযুগলের সেবা-সম্পদলাভ করা যায়। তাই দেখা যায়, শ্রীনিবাস তাঁহার গুরু গুণমঞ্জরীর (গোপাল ভট্টের) নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

১ বিরাজন্তীমাভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

* * *

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব—২ লহরী, শ্লোক নং ১৩১ (বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র, ২য় সংস্করণ)

২ চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য, ৮ম পরিচ্ছেদ—ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত, (সাহিত্য অকাদেমী সং) পৃঃ ১৮৬

তুহুঁ গুণ মঞ্জরি রূপে গুণে আগরি
মধুর মধুর গুণধামা।
ব্রজনব-যুব-দ্বন্দ্ব প্রেমসেবা পরবন্ধ
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা॥
কি কহিব তুয়াবশ তুহুঁ সে তোমার বশ
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে
আপন অনুগা করি করুণা কটাক্ষে হেরি
সেবা-সম্পদ্ কর দানে॥[১]

এই মঞ্জরীভাবের সাধনার কথা পদ্ম-পুরাণের পাতাল খণ্ডে (বঙ্গবাসী-সংস্করণ, অধ্যায় ৫২, পৃঃ ৪১৫) দেখা যায়। ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার মতে এই পাতাল খণ্ড খ্রীষ্টীয় নবম হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেন—"যদি পদ্মপুরাণের এই অংশ অকৃত্রিম হয় তাহা হইলে মঞ্জরীভাবের উপাসনা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিতে হয়।"[২]

মঞ্জরীভাবের সাধনার কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও শ্রীচৈতন্যের সময়ে ইহার নাম-গন্ধও ছিল না। সনাতন গোস্বামীর 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে'ও মঞ্জরীভাবের উপাসনার কোন ইঙ্গিত নাই। কিন্তু তাঁহাকে মঞ্জরীদের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' রচিত হইবার পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীরূপ 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' রচনা করেন। এই গ্রন্থে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
(পূর্ব—২ লহরী, শ্লোক ১৫১)

১ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৪৩২

২ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ (১৯৬১), পৃঃ ৪২৯

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"সাধকরূপেণ যথাবস্থিত-দেহেন। সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন। তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবো রতিবিশেষ-স্তল্লিপ্সুনা।" ইহার তাৎপর্য হইল যে, সাধক যেমন দেহে বর্তমান আছেন সেই দেহেই এবং সিদ্ধরূপে অর্থাৎ নিজের ভাবের অনুকূল কৃষ্ণ-সেবার উপযোগী মনে মনে ভাবা দেহে ব্রজে অবস্থিত নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রিয়বর্গের ভাবলিপ্সু হইয়া তাঁহাদের অনুসরণে সেবায় প্রবৃত্ত হইবেন। ইহার পর শ্রীজীব আবার বলিতেছেন "ব্রজ-লোকাস্তত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ" অর্থাৎ সিদ্ধ-প্রণালী অনুসারে যিনি যে সখীর অনুগামী, তিনি তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-সেবায় প্রবৃত্ত হইবেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীই মঞ্জরী ভাবের সাধনার প্রবর্তক।

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম এই মঞ্জরীভাবের সাধনাই গৌড়ে আনিয়া প্রচার করেন। শ্রীনিবাসের প্রধান শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ "স্মরণ-দর্পণ" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেও মঞ্জরীভাবের সাধন-রহস্যের বর্ণনা আছে।

কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় মঞ্জরীদের নাম আছে। পরবর্তী সময়ে বৃন্দাবনের কৃপাসিন্ধু দাস বাবাজী, গোপালগুরু (মকরধ্বজ পণ্ডিত) গোস্বামীর শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর পদ্ধতি অনুযায়ী রাধা-কৃষ্ণের যোগপীঠের চিত্র অঙ্কন করেন। তাহাতেও মঞ্জরীদের নাম দেওয়া আছে।[১]

অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ

রাগানুগভাবে রাধা-কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার স্মরণই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণের প্রধান সাধন। পদ্মপুরাণের পাতাল

---

১ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৪২৭

খণ্ডে (বঙ্গবাসী সংস্করণের ৫২ এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৮৩ অধ্যায়) এই অষ্টকালীয় লীলার বর্ণনা আছে। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মতে পদ্মপুরাণের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত না হইলে ইহাই অষ্টকালীয় লীলাধ্যানের মূল বলিয়া ধরিতে হইবে।[১] রূপ গোস্বামীর রচনা বলিয়া কথিত 'স্মরণ মঙ্গল স্তোত্রে' সূত্রাকারে এই অষ্টকালীয় লীলা বর্ণিত হইয়াছে। অনেকের মতে এই স্তোত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই বিষয়ে রচনার উৎসস্বরূপ। কবিকর্ণপূরের 'কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী,' কবিরাজ গোস্বামীর 'গোবিন্দলীলামৃত' এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'কৃষ্ণ-ভাবনামৃত' গ্রন্থে অষ্টকালীয় লীলার বিস্তার আছে। উনবিংশ শতকে সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী 'ভাবনাসার সংগ্রহ' রচনা করেন। ইহাতে গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণ-ভাবনামৃত, কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রায় তিন হাজার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবির পদাবলীতেও এই অষ্টকালীয় লীলার বর্ণনা আছে। 'নিশান্তলীলা' হইতে এই অষ্টকালীয় লীলার আরম্ভ। ইহার পর 'প্রাতর্লীলা,' 'পূর্বাহ্নলীলা,' 'মধ্যাহ্নলীলা,' 'অপরাহ্ন-লীলা,' 'সায়ং-লীলা,' 'প্রদোষ-লীলা,' ও সর্বশেষে 'নৈশ-লীলা' বিচিত্র পরিবেশের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। শ্রীরাধাই এই লীলার প্রধান অবলম্বন।

শ্রীচৈতন্যের মূর্তিপূজা

শ্রীচৈতন্যের প্রকট কালেই কোন কোন ভক্ত তাঁহার মূর্তি-পূজা আরম্ভ করেন। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেন যে, "মুরারি গুপ্তের মুদ্রিত কড়চার চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দ্দশ সর্গ যদি অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন"।[২]

১ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃ: ৪৩৯

২ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃঃ ৬০৩ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত—১৯৩৯)

এই মূর্তি স্থাপনের প্রায় সমকালেই গৌরীদাস পণ্ডিতও গৌর-নিতাই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] গৌরীদাসের সকল ধ্যান-ধারণা ছিল গৌর-নিতাই-এর মধ্যেই নিবদ্ধ। এই জন্য মহাপ্রভু নিজেই নাকি গৌরীদাস পণ্ডিতকে তাঁহাদের (গৌর-নিতাই-এর) মূর্তি প্রকাশ করিতে বলেন—

> পণ্ডিতের মন জানি প্রভু গৌরহরি।
> একদিন পণ্ডিতের কহয়ে যত্ন করি॥
> —"নবদ্বীপ হইতে নিম্ব বৃক্ষ আনাইবে।
> মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্ম্মাণ করিবে॥
> অনায়াসে নির্ম্মাণ হইব মূর্ত্তিদ্বয়।
> তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয়॥"
>
> —ভক্তিরত্নাকর, ৭ম তরঙ্গ[২]

শ্রীচৈতন্যের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বংশধরগণ শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণে শ্রীচৈতন্যের এক দারু-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজাদির ব্যবস্থা করেন। এই মূর্তি চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের বছরেই স্থাপিত হয় বলিয়া প্রবাদ। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম জ্ঞাতি-পুত্র শ্রীহট্টের বুরুঙ্গ-নিবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র সংস্কৃতে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" রচনা করেন এবং তাহার "মনঃসন্তোষিণী" নামে বঙ্গানুবাদ করেন শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণ নিবাসী জগজ্জীবন মিশ্র।[৩] এই সব গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর হইতে বরাবর শ্রীহট্টে চলিয়া যান এবং পিতামহের বংশধরগণের প্রতিপালনের জন্য নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করান। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর হইতে শ্রীচৈতন্য সোজা নীলাচলে চলিয়া যান বলিয়াই সকল সমসাময়িক গ্রন্থকার-গণের অভিমত। কাজেই এই উক্তি বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ

১ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃঃ ৬০৩ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত—১৯৩৯)

২ গৌড়ীয় মিশন-সং (১৯৪০), শ্লোক—৩৪৬-৩৪৮, পৃঃ ৩৫২

৩ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন (১ম সং), পৃঃ ৭১ ও ১১৭

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" গ্রন্থ যে জাল তাহা ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার প্রমাণ করিয়াছেন।[১]

মহাপ্রভুর পরম ভক্ত কাশীশ্বর পণ্ডিত বৃন্দাবনে গোবিন্দের পার্শ্বে গৌরাঙ্গ-মূর্তি স্থাপন করেন। পুরীধামে মহাপ্রভু কাশীশ্বরকে বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলে—

কাশীশ্বর কহে—প্রভু তোমারে ছাড়িতে।
বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে॥

—ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ[২]

তখন মহাপ্রভু—

কাশীশ্বর অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি।
দিলেন নিজ স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি॥
প্রভু সে-বিগ্রহ সহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল॥
শ্রীগৌরগোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা।
তাঁরে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা॥
শ্রীগোবিন্দ-দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া।
করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥

—ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ[৩]

শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুর গৌরাঙ্গের মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর শ্রীখণ্ডে গেলে রঘুনন্দন তাঁহাকে ঐ মূর্তি দর্শন করান এবং নরোত্তম প্রেমাবেশে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রণাম করেন—

ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে॥

—ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ[৪]

১ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (১৯৩৯), পৃঃ ৬০৪
২ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক—৪৩৯, পৃঃ ৫৯
৩ ঐ শ্লোক—৪৪০-৪৪৩, পৃঃ ৫৯৪
৪ ঐ শ্লোক—৪৩২, পৃঃ ৩৭৬

পরবর্তী সময়ে এই গৌর-মূর্তির পার্শ্বে বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তিও স্থাপিত হয়। রঘুনন্দনেব অপ্রকটের কিছুদিন পরে তাঁহার পুত্র ঠাকুর কানাই ইহা প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে প্রত্যাগত হইয়া নরোত্তম যখন কাটোয়ায় গমন করেন, তখন সেখানে গদাধর দাস স্থাপিত গৌরাঙ্গ মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন

দাস গদাধরের জীবন গোরাচান্দে।
নিরখিয়া নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥

—ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ[২]

হরিদাস বাবাজী 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন'-গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃ৹ ১২) লিখিয়াছেন যে, কুলাই গ্রাম নিবাসী কংসারি ঘোষ (নরহরি সরকার ঠাকুরের শাখা) শ্রীচৈতন্যের তিনটি বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া নরহরি সবকাব ঠাকুবকে সমর্পণ করেন। এই মূর্তি-ত্রয়ের ছোটটি শ্রীখণ্ডে, মধ্যমটি গঙ্গানগরে (বগুড়া) এবং বড়টি কাটোয়ায় স্থাপিত হয়।

জনশ্রুতি এই যে, মুবারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের এক দারু-বিগ্রহেব সেবা করিতেন এবং ঐ বিগ্রহের পাদ-পীঠে তাঁহার নাম ক্ষোদিত ছিল। এই মূর্তি বীরভূম হইতে আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে এই বিগ্রহ বৃন্দাবনে সেবিত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অনেক বছর পরে নরোত্তম ঠাকুর খেতরিতে বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ গৌরাঙ্গ-মূর্তি স্থাপন করেন। খেতরির উৎসবপ্রসঙ্গে ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

জগদীশ পণ্ডিত নদীয়া জিলার চাকদহের নিকট যশোড়া গ্রামে গৌরাঙ্গ-মূর্তি এবং তাঁহার ভ্রাতা মহেশ পণ্ডিত নদীয়া জিলার চাকদহের নিকট পালপাড়া গ্রামে গৌর-নিত্যানন্দের মূর্তি নিমাণ করাইয়া সেবা প্রকাশ করেন।

১ গৌর গুণানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, (২য় সং), পৃঃ ২৩০
২ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক— ৪৫৩, পৃঃ ৩৭৭

মহারাজ সীতারাম রায় ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ভক্ত। ইঁহার গুরুর নাম—কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী। যশোহর জিলার (অধুনা পূর্ব-পাকিস্তানে) ঘোষপুর গ্রামে সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুইটি আখড়া স্থাপন করেন। ইহার একটি আখড়ায় তিনি শ্রীচৈতন্যের মূর্তি নির্মাণ করাইয়া সেবা প্রকাশ করেন।[১]

গোস্বামিমতে পরাহে

গৌড়ীয় মতের সহিত স্মার্ত-মতের কিছু কিছু মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। একাদশী নির্ণয়ের বিধিপর্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে। বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থ 'হরিভক্তি বিলাসে' এইগুলির উল্লেখ আছে। চৈতন্যোত্তর যুগে শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদির মাধ্যমে গোস্বামি-গ্রন্থসমূহ যখন গৌড়ে আনীত হইয়া প্রচারিত হইতে থাকে, তখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাধারণের মধ্যে এইসব বিধি-নিষেধও ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে।

একাদশী সম্বন্ধে বিশেষ বিধি হইল যে, অরুণোদয়ে দশমী সংযুক্ত হইলে সেই একাদশী ত্যাগ করিয়া পরদিনে উপবাস করিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত আটটি মহা-দ্বাদশী নির্ণীত হইয়াছে। এই মহা-দ্বাদশী প্রাপ্ত হইলে একাদশী লঙ্ঘন করিয়া ঐদিন উপবাস করিতে হয়। এই অষ্ট মহা-দ্বাদশী হইল—উন্মিলনী, ব্যঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপনাশিনী।

বামন দ্বাদশী

স্মৃতিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। ভাদ্রমাসে শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত শুক্লা-দ্বাদশীতে বামনদেবের আবির্ভাব। বামন হইতেছেন বিষ্ণুরই অবতার। সেইজন্য এই তিথি পালনে বৈষ্ণবগণের উপর বিশেষ বিধি। একাদশীর নিশাভাগে অথবা দ্বাদশীতে বামনদেবের অর্চনা

---

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৫০

করিতে হয়—"একাদশ্যাং রজন্যাং বা দ্বাদশ্যাং চার্চ্চয়েৎ প্রভুম্।" (হরিভক্তিবিলাস—১৫।২৬৫)

ভাদ্র মাসের শুক্লা-দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে শ্রবণা দ্বাদশীও বলে।

বিদ্ধা

তিথির সম্পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য নিধারিত সময়ের মধ্যে অন্য তিথির প্রবেশ (বেধ) হইলে সেই তিথিকে বিদ্ধা তিথি বলে। বিদ্ধা দুই প্রকার—পূর্ব-বিদ্ধা ও পর-বিদ্ধা। তিথির সম্পূর্ণতার জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বভাগে অন্য তিথি থাকিলে তাহাকে পূর্ব-বিদ্ধা বলে এবং শেষভাগে অন্য তিথি থাকিলে হয় পর-বিদ্ধা। গোস্বামিমতে পূর্ব-বিদ্ধা পরিত্যাজ্যা, পর-বিদ্ধা নহে। জন্মাষ্টমী, রামনবমী, একাদশী, নৃসিংহ চতুর্দশী প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রতেরই পূর্ব-বিদ্ধা ত্যাজ্যা। সনাতনের শিক্ষাপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু বলিয়াছেন--

> একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামন দ্বাদশী।
> শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী॥
> এই সভের বিদ্ধা ত্যাগ অবিদ্ধা করণ।
> অকরণে দোষ কৈলে, ভক্তির লভন॥
>
> —চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৪শ পরিচ্ছেদ

বিষ্ণু-শৃঙ্খল যোগ

একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা--এই তিনেরই দেবতা—বিষ্ণু। এইজন্য একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা যদি একই দিনে পরস্পর মিলিত হয়, তাহা হইলে বিষ্ণু-শৃঙ্খল যোগ হয়। এই যোগে উপবাস বিধি।

দেব-দুন্দুভি যোগ

বিষ্ণু-শৃঙ্খলেরই অবস্থা বিশেষ। একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী, শ্রবণা ও বুধবার হইলে দেব-দুন্দুভি যোগ হয়। এই যোগে উপবাস বিধি।

গোবিন্দ দ্বাদশী

ফাল্গুন মাসের শুক্লা-দ্বাদশীতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে গোবিন্দ দ্বাদশী বলে। এই তিথিতে উপবাস বিধি। ইহাকে আমর্দকী দ্বাদশীও বলে।

শিবরাত্রি ব্রত

শিবরাত্রি ব্রত নির্ণয়েও কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে। হরিভক্তি-বিলাসে এগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্নকূট

বাঙালীর স্মৃতি-গ্রন্থে অন্নকূট উৎসবের কোন উল্লেখ না থাকিলেও আমাদের ধর্মোৎসবের তালিকায় এই উৎসব একটি স্থায়ী রূপ গ্রহণ করিয়াছে। দীপান্বিতার পরের দিনে কার্তিকী শুক্লা-প্রতিপদে কাশীর অন্নপূর্ণা-মন্দিরে সাড়ম্বরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-মন্দিরে এবং অপরাপর স্থানের অনেক দেবালয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

প্রবাদ এই যে, পুরাকালে ব্রজবাসিগণ এই তিথিতে ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হইয়া ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া দেন এবং তৎস্থলে গোবর্ধন এবং গো-পূজার প্রবর্তন করেন। তাঁহার যুক্তি ছিল—গো-ধনই ব্রজবাসিগণের সম্পত্তি এবং সেই জন্য গো-পূজা একান্ত আবশ্যক। গিরি-গোবর্ধন তৃণাদি দ্বারা গো সকলের আহার্য যোগায়। কাজেই গোবর্ধনও ব্রজবাসিগণের মহোপকারক। এইজন্য গোবর্ধনের পূজা করা সঙ্গত। এই যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া ব্রজ-বাসিগণ উক্ত তিথিতে ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে গোবর্ধনের পূজা করেন এবং পূজার উপকরণরূপে অন্ন দ্বারা পর্বত প্রমাণ স্তূপ (অন্নের কূট) সজ্জিত করেন। সেই জন্য এই উৎসবের নাম অন্নকূট।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মূলতঃ ইহা গোবর্ধন পূজা। 'স্মৃতি-কৌস্তুভ', 'ধর্ম-সিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থে এই পূজায় গোময় বা অন্নের দ্বারা গোবর্ধন গিরির প্রতীক নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। গিরি-গোবর্ধনের

নিকটে অন্নকুট নামে একটি গ্রামও আছে।[১] বরাহ পুরাণে (১৬৪ অধ্যায়ে) ইহার পরিক্রমার বিধান আছে। মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গিরি-গোবর্ধনে উপনীত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রের স্থাপিত গোবর্ধনধারী শ্রীগোপাল বিগ্রহ আবিষ্কার করিয়া তাঁহার অন্নকুট উৎসব অনুষ্ঠান করেন—

হেন মতে অন্নকুট করিল সাজন।
পুরী গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥
—চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য, ৪র্থ পরিচ্ছেদ[২]

মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উৎসব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। গোস্বামিমতে গোবর্ধনার্চন, গো-পূজা, অন্নকুট উৎসবের অনুষ্ঠান প্রভৃতি করণীয়।

নিয়মসেবা

সারা কার্তিক মাস নিয়ম করিয়া বিষ্ণুর সেবা করা হয়। এইজন্য বৈষ্ণবদিগের নিকট কার্তিক মাস একটা মহাপুণ্য মাস বলিয়া পরিগণিত—"যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে। তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং সত্যোক্তং তব নারদঃ॥[৩] চান্দ্র আশ্বিনে শুক্ল-পক্ষের একাদশীর দিন হইতে (বিজয়া দশমীর পরদিন) কার্তিকী শুক্লা একাদশী (উত্থান একাদশী) পর্যন্ত নিয়মসেবা করিতে হয়। মহাপ্রভুর প্রকটকালে এই নিয়মসেবার কোথায়ও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। চৈতন্যোত্তর যুগে ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

রথযাত্রা

আষাঢ়ী শুক্লা-দ্বিতীয়ায় যে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইল জগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় উত্থান একাদশীর সন্ধ্যায়। হরিভক্তি বিলাসে ইহার বিধান আছে।

১ চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য, ১৮শ পরিচ্ছেদ—ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত (১৯৬৩) পৃঃ ৩৩০

২ ঐ পৃঃ ১৪০

৩ হরিভক্তি বিলাস—১৬ বিলাস

তুলসীবন পূজা

চৈতন্যোত্তর যুগে ইহার প্রচলন। হরিভক্তি বিলাসে ইহার বিধান আছে।

তিলকধারণ বিধি

তিলকধারণ বিধিরও স্বতন্ত্রতা আছে। হরিভক্তি বিলাসে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

শালগ্রাম পূজাবিধি

মহাপ্রভু কায়স্থকুলোদ্ভব রঘুনাথ দাসকে নিজের পূজিত গোবর্ধন-শিলা দিয়াছিলেন। তিনি ভক্ত-বৈষ্ণবের পক্ষে স্মার্তমত অনুসরণ প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই সার্বজনীন আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া হরিভক্তি বিলাসে বিধান দেওয়া হইয়াছে—

এবং শ্রীভগবান সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥ (৫।২২৩)

অর্থাৎ কি দ্বিজ, কি স্ত্রী, কি শূদ্র সকল ভক্তই শালগ্রাম শিলারূপী ভগবানের পূজা করিবেন। এই বিধির প্রমাণস্বরূপ হরিভক্তি-বিলাসে স্কন্দ-পুরাণের বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি নচান্যেষাং কদাচন॥

বিষয়টিকে আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার জন্য সনাতন গোস্বামী টীকায় বলিয়াছেন—"ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেন শূদ্রাদিনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব।"

মহোৎসব

শ্রীনিবাস. নরোত্তম প্রভৃতি বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফিরিবার পরে চারিদিকে মহোৎসবের ধুম পড়িয়া যায়। এই মহোৎসবে সপরিকর মহাপ্রভুর ভোগ-দানের বিধি আছে। বর্তমানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-

সমাজে এই "মহোৎসব" এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই অনুষ্ঠানের ভোজন-আরতিকালে নরোত্তম-রচিত যে গানটি (ভক্তপতি উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি .... ইত্যাদি) গাওয়া হয়, তাহাতে মনে হয়, সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে মহাপ্রভুর ভোজন-বিলাসের অনুষ্ঠান হইতে এই মহোৎসবের সূত্রপাত।

ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাবের পর পুরীধামে মহাপ্রভু-মহোৎসবের (মচ্ছবের) অনুষ্ঠান করেন। ইহাকে পারলৌকিক অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। সেইজন্য দেখা যায়, বৈষ্ণবগণের মধ্যে সব রকম নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে "মহোৎসব" করিবার প্রথা আছে।

হরিলুট

বর্তমানে হরিলুট প্রদান বৈষ্ণব-সমাজের ধর্ম-কর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ মহাপ্রভুর সময়ে ইহার প্রচলন ছিল কিনা জানা যায় না, 'হরিভক্তি-বিলাসে'ও ইহার কোন উল্লেখ নাই। জনশ্রুতি এই যে, হরিদাস ঠাকুর যখন বেনাপোলে ছিলেন, তখন তিনি নিবেদিত বাতাসা হরিধ্বনি-সহ বালকগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। ইহা সত্য হইলে, এই ধারারই অনুবৃত্তি বৈষ্ণব-সমাজে চলিয়াছে বলিতে হইবে।

কীর্তন করিতে করিতে হরিধ্বনি-সহ সকলের মধ্যে বাতাসা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এইজন্য যে কীর্তন গীত হয়, তাহার কোন ধরা-বাঁধা রূপ নাই, এক-এক অঞ্চলের অধিবাসিগণ তাঁহাদের সুবিধামতো গীত রচনা করিয়া লইয়াছেন। উদাহরণ

১

প্রেমানন্দে হরি বলরে ভাই।
এই আনন্দে নেচে-গেয়ে ব্রজ-ধামে চলে যাই॥
চৌদিকে খোল-করতাল বাজে,
মধ্যে নাচে গৌর-নিতাই।
চিনির মণ্ডা ফুল-বাতাসা হরিনামে লুট বিলাই॥

২

হরিলুট পড়েছে আনন্দের আর সীমা নাই—
চাঁদ-বদনে হরি বল ভাই—
(আমরা) এই আনন্দে নেচে-গেয়ে
ব্রজের পথে চলে যাই।
হরি বল, বলরে ভাই—
ব্রজের পথে চলে যাই॥
(ওরে) বোবায় বলে হরি হরি
অন্ধ নয়ন মেলে চায়।
আমারে কি করবেন দয়া
ব্রজের কিশোরী রাই—
শ্যামের চূড়াতে ময়ূর পাখা
(চূড়া) বামে হেলা দেখতে পাই।
(আমরা) বিনা সূতে গেঁথে মালা
সাজাব কিশোরী রাই॥

৩

একবার এস শ্রীশচীনন্দন
হরিলুটে কর আগমন
তুমি আপনি এসে শ্রীহাস্তেতে
লুট করে দাও বিতরণ।
আমরা মন্ত্র-তন্ত্র নাইকো জানি,
নামেতে হয় নিবেদন,
তোমার নামেতে হয় নিবেদন॥

চতুষ্প্রহর, অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর

চতুষ্প্রহর, অষ্টপ্রহর বা চব্বিশ প্রহর পর্যন্ত সময় ব্যাপিয়া নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বর্তমানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সাধারণ্যে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে প্রথমে

এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরে স-পারিষদ মহাপ্রভুর ভোগদানের ব্যবস্থা থাকে।

মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে সারা রাত ধরিয়া কীর্তন করিতেন। এমন কি, অনেক সময় তাঁহার আরও দীর্ঘকাল কীর্তনানন্দে অতিবাহিত হইয়া যাইত। সম্ভবতঃ এই আদর্শ হইতেই চতুষ্প্রহর, অষ্টপ্রহর বা চব্বিশ প্রহর সময় ব্যাপিয়া কীর্তন-যজ্ঞের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণবেরা জানেন, এই 'নাম' হইতেই সর্ব-পাপক্ষয় হয় এবং "সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সার।"

ধূলট

'হরিভক্তিবিলাসে' এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না থাকিলেও নবদ্বীপের ইহাই একটি বিশেষ উৎসব। ১২৫০ বঙ্গাব্দ (খ্রীষ্টীয় ১৮৪৪ অব্দ) হইতে নবদ্বীপে ইহা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

মাধবচন্দ্র দত্ত নামে কলিকাতাবাসী জনৈক ধনাঢ্য ভক্ত সর্ব প্রথম নবদ্বীপে গান-মেলার উদ্যোক্তা। বড় আখড়ার সম্মুখবর্তী নাট-মন্দির ইহারই প্রতিষ্ঠিত এবং এই নাট-মন্দিরেই গান-মেলার প্রথম অধিবেশন। প্রবাদ এই যে, নগর-কীর্তনকালে উক্ত দত্তমহাশয় সকলের গাত্রে নবদ্বীপের রজঃ (ধূলি) নিক্ষেপ করিতেন। এই ঘটনা হইতে এই উৎসবের নাম ধূলট। তদবধি নিয়মিতভাবে নবদ্বীপে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

গোস্বামী উপাধি

চৈতন্য-পরিকরবৃন্দের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই এখন গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থ বলিয়াছেন—"কিছুদিন পূর্ব্বেও যাঁহারা চক্রবর্তী, চট্টোপাধ্যায় …প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা কোন সূত্রে কোন বিগ্রহের সেবা পাইয়া বা ভাগবত-পাঠ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া গোস্বামী উপাধি ধারণ করিয়াছেন।"[১]

১ শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান (১৯৩৯), পৃঃ ৬৩৩

এই 'গোস্বামী' উপাধির উৎপত্তি কোন্ সময় হইতে হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে নির্ণয়ের কোন সূত্র নাই। ষোড়শ শতকে গোস্বামী শব্দের বহুল প্রচলন দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ছয় আচার্য—রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব "ষড় গোস্বামী" নামে আজিও নিত্য বন্দিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নামে খ্যাত। চৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ) পাঠে জানা যায়, যাদবাচার্য, কাশীশ্বর, ভূগর্ভ প্রভৃতিও "গোসাঞি" আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। এই 'গোসাঞি' বা 'গোঁসাই' হইতেছে 'গোস্বামী'-শব্দের অপভ্রংশ। এই 'গোস্বামী' উপাধির উৎপত্তির কারণ দেখাইতে গিয়া ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেন—"The term may have originatad or at least obtained currency from the peculiar theory of Caitanyaism that the only and original form, dress and occupation of Kṛṣṇa as the supreme being is that of a Gopa ; his faithful devotee is necessarily a 'cow-lord'.[১]

ডক্টর দের এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। 'গোস্বামী' শব্দের অর্থ গো (ইন্দ্রিয়) এবং স্বামী (প্রভু)। তাহা হইলে অর্থ হইল—ইন্দ্রিয়ের প্রভু অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়। বাচস্পত্যাভিধানে এইরূপ অর্থ দেখা যায়। সাহিত্য অকাদেমী হইতে প্রকাশিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দকোষেও এইরূপ অর্থ আছে। কাজেই জিতেন্দ্রিয়তা হেতু বৈষ্ণব যতির উপাধি বিশেষ হিসাবে 'গোস্বামী' শব্দ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

উপসংহার

উপরে বৈষ্ণব-স্মৃতি-গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাস' হইতে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহা সমস্তই মহাপ্রভু সূত্রাকারে সনাতনকে উপদেশ করিয়া ছিলেন। ইহা ছাড়া হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবের করণীয়

১ Vaisava Faith and Movement (১ম সং), পৃঃ ৮২

সব কিছুই বর্ণিত আছে। মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া বলেন—

প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৪শ পরিচ্ছেদ[১]

সনাতনকে তিনি আরও বলেন—"সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন।" ইহাই বৈষ্ণব স্মৃতির বিশেষত্ব। শ্রীনিবাস-নরোত্তমের মারফত গোস্বামিগ্রন্থসমূহ যখন বাঙলায় আনীত হইয়া প্রচারিত হয়, তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠা ধীরে ধীরে দেশময় সম্প্রসারিত হইতে থাকে।

১ সুকুমার সেন-সম্পাদিত (সাহিত্য অকাদেমী সং) পৃঃ ৪০৫

পঞ্চম অধ্যায়

পালা বদল

সূচনা

শ্রীজীব গোস্বামীর তিরোধানের পর শ্রীনিবাস-নরোত্তমই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিয়ন্তা হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু এই দুইজনের যখন অভাব হইল, তখন তাঁহাদের স্থানপূরণের যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ রহিলেন না।

শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পর দাস গোস্বামী বিরহ-বিহ্বল হইয়া ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে গিয়া রাধাকুণ্ড তীরে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার সময় হইতে রাধাকুণ্ডের মহন্ত-পদের সৃষ্টি হয় এবং তিনিই রাধাকুণ্ডের প্রথম মহন্ত। দ্বিতীয় মহন্ত- শ্রীজীব গোস্বামী। শ্রীজীবের তিরোধানের পর মহন্ত হন - কৃষ্ণদাস এবং তাঁহার পর— নন্দকিশোর। কাজেই শ্রীনিবাস-নরোত্তমের অপ্রকটের পর রাধা-কুণ্ডে মহন্তের পদ ছিল এবং এ পদ এখনও আছে।[১]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীনিবাস-নরোত্তমের প্রকটকালেও ভক্ত-বৈষ্ণব রাধাকুণ্ডে মহন্ত-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গণের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইতেন। তবে ষড়-গোস্বামিগণের মতো ইঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না এবং শ্রীনিবাস-নরোত্তমই ছিলেন শ্রীজীবের যোগ্য উত্তরাধিকারী। কাজেই এই দুই বৈষ্ণবাচার্যের অপ্রকটে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃই নেতা-শূন্য হইয়া পড়েন। পরবর্তী সময়ে এই অভাব পূরণ হয় আবার দুইজন আচার্যের আবির্ভাবে। ইঁহাদের নাম—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ।

১ নবদ্বীপ দাস—শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস, পৃঃ ৩৬

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

শ্রীজীব গোস্বামীর পর এমন অসাধারণ পণ্ডিত এবং সাধক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিশ্বনাথের জন্ম দেবগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বংশে। এই দেবগ্রাম কোথায় অবস্থিত, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন, এই দেবগ্রাম নদীয়া জেলায়, আবার কাহারও মতে ইহা মুর্শিদাবাদ জিলার সাগরদিঘি থানার অধীন একখানি গ্রাম। তবে এ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নাই।

বিশ্বনাথের আবির্ভাব ও তিরোভাব-কাল লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। শ্যামলাল গোস্বামীর মতে বিশ্বনাথের প্রকটকাল খ্রীষ্টাব্দ ১৬২৬-১৭০৮। বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনীতে বিশ্বনাথের প্রকটকাল দেওয়া আছে—খ্রীষ্টাব্দ ১৬৪৬- ৭৫৭।[১] আবার মুর্শিদাবাদ জিলার সৈদাবাদে বিশ্বনাথের প্রথম জীবনের আবাস-স্থান মোহনরায়ের ঠাকুরবাড়ীতে যে স্মৃতি-ফলক স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে উঁহার প্রকটকাল খোদিত আছে শকাব্দ ১৫৬২-১৬৫২ অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৬৪০-১৭৩০। এইসব বিভিন্ন তারিখের মধ্যে কোনটি সমীচীন তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

বিশ্বনাথের শেষ রচনা ভাগবতের টীকা 'সারার্থদর্শিনী'। ইহার রচনা ১৬২৬ শকাব্দে (১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে) সমাপ্ত হয় বলিয়া তিনি নিজেই ইহার উপসংহার শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেন। মনে হয়, তিনি এই সময় অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য দেখা যায়, ১৬২৮ শকাব্দে (১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ) জয়পুরে 'গলতা' নামক পর্বতসঙ্কুল প্রদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন বিচার-সভা ডাকা হয়, তখন তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহার আদেশে বলদেব বিদ্যাভূষণ গিয়াছিলেন এবং তাঁহার

---

১ নবদ্বীপ দাস—শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস, পৃঃ ৩৭

২ বর্তমান লেখকের—বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ পৃঃ ১২

সঙ্গে গিয়াছিলেন কৃষ্ণদেব সার্বভৌম।[১] আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ বলেন, বলদেব বিদ্যাভূষণ সম্ভবতঃ জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের (২য়) সমসাময়িক ছিলেন।[২] জয়সিংহ (২য়) ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৩] কাজেই ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংহের (২য়) রাজত্বকালে এই সভার অধিবেশন হয় বলা যাইতে পারে এবং তখন বিশ্বনাথ জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শিনীর মতে ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং সৈদাবাদে স্মৃতি-ফলকের ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বনাথের প্রকটকাল ধরিলে দেখা যায় যে, ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিচার-সভা অনুষ্ঠিত হইবার পরেও যথাক্রমে ৪৮ বছর বা ২৪ বছর তিনি প্রকট ছিলেন। যে লোক ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সারার্থদর্শিনী' রচনার পরেও এত দীর্ঘকাল জীবিত রহিলেন এবং যে লোক সারা জীবন ধরিয়া অজস্র গ্রন্থ রচনা করিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন কথা শোনা গেল না এবং এমন কি, একখানি গ্রন্থও আর তিনি রচনা করিলেন না, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কাজেই উক্ত তারিখ-দ্বয়ের কোনটিই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের পর সম্ভবতঃ আর তাঁহার কোন বিশেষ কর্ম-ক্ষমতা ছিল না এবং কয়েক বছর জরাগ্রস্ত অবস্থায় কোনরূপে তিনি বর্তমান ছিলেন। এইজন্যই বোধহয় প্রবাদ আছে যে, ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের টীকা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি নিত্যধামে গমন করেন।[৪] এক্ষেত্রে শ্যামলাল গোস্বামীর মতে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১১৯১

২ গোপীনাথ কবিরাজ—সিদ্ধান্ত রত্নম্ (Saraswat Bhavana Texts, No. 10, Part II)—ভূমিকা, পৃঃ ৩

৩ Imperial Gazetteer of India. Provincial Series, Rajputana, পৃঃ ২৩৭

৪ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, ভূমিকা—পৃঃ ৸৴০

প্রকটকাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যদিও এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না।

বিশ্বনাথের পিতার নাম—রামনারায়ণ চক্রবর্তী।[১] বিশ্বনাথ ছিলেন পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামভদ্র এবং মধ্যম ভ্রাতার নাম রঘুনাথ। এই দুই ভাই-এর বংশধর অদ্যাপি বর্তমান আছেন।

দেবগ্রামেই বিশ্বনাথের বিদ্যারম্ভ। সেখানে থাকিয়া তিনি কাব্য-ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপন করেন। তদনন্তর তিনি মুর্শিদাবাদ জিলার সৈদাবাদে গমন করেন। তৎকালে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইনি ছিলেন নরোত্তম ঠাকুরের ব্রাহ্মণ-শিষ্যের অন্যতম।[২] সমাজে ইঁহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং নিত্য পাঁচশত ছাত্রকে তিনি অন্নদান করিতেন—"পাঁচশত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈলা দান।"[৩] এই গঙ্গানারায়ণের কাছে বিশ্বনাথ কিছুদিন অধ্যয়ন করেন বলিয়া শোনা যায়। পরবর্তী সময়ে তিনি নরোত্তমের অন্যতম ব্রাহ্মণ-শিষ্য রামকৃষ্ণ আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র সৈদাবাদবাসী কৃষ্ণচরণের কাছে শ্রীমদ্-ভাগবতাদি অধ্যয়ন করেন।[৪]

পাঠ-সমাপনের পর বিশ্বনাথ দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ কাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ রামকৃষ্ণ আচার্যকে, আবার কেহ কেহ বা কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীকে বিশ্বনাথের গুরু বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলেই এ সমস্যার সমাধান হয়।

---

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব জীবন (১ম সং), পৃঃ ১৩৩

২ এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৩ প্রেম-বিলাস, ২০ বিলাস (বহরমপুর সং), পৃঃ ৩৫৫

৪ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব জীবন, পৃঃ ১৩৩

নরোত্তমের তিরোধানে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ আচার্য নরোত্তম-শাখার বৈষ্ণবগণের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ান। গঙ্গানারায়ণের বিষ্ণুপ্রিয়া নামে এক কন্যা ব্যতীত আর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। রামকৃষ্ণ আচার্য ছিলেন গঙ্গানারায়ণের পরম-বন্ধু। গঙ্গানারায়ণের পুত্র-সন্তান না থাকায় রামকৃষ্ণ আচার্য তাঁহাকে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণকে পোষ্যরূপে দান করেন।[১]

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর দত্তক-পুত্র এই কৃষ্ণচরণই উত্তরকালে পরিণত বয়সে সৈদাবাদে ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন এবং বিশ্বনাথ তাঁহার নিকটই শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি অধ্যয়ন করেন বলিয়া পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই কৃষ্ণচরণের পুত্র এবং শিষ্য রাধারমণ চক্রবর্তীও তৎকালে মোহনরায় বিগ্রহের সেবকরূপে সৈদাবাদে অবস্থান করিতেন।

সৈদাবাদ অঞ্চলে 'মোহনরায়' এবং 'কৃষ্ণরায়' হইতেছেন প্রাচীন বিগ্রহসমূহের অন্যতম। শিবাই আচার্য নামে এক ঘোর শাক্ত ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে গোয়াস গ্রামে। তিনি ছিলেন রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ হরিরাম এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। শিবাই-এর পুত্রদ্বয় একবার দুর্গা পূজার জন্য ছাগ ক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা উভয়েই নরোত্তমকে দেখিয়া মোহিত হন এবং হরিরাম রামচন্দ্র কবিরাজের নিকট এবং রামকৃষ্ণ নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।[২]

পরবর্তী সময়ে হরিরাম আচার্য এবং রামকৃষ্ণ আচার্য উভয়েই সৈদাবাদে বাস করিতেন এবং হরিরাম কৃষ্ণরায় বিগ্রহের এবং রামকৃষ্ণ মোহনরায় বিগ্রহের সেবা করিতেন। অদ্যাপি হরিরাম ও

১ নরোত্তমবিলাস, ১২ (বহরমপুর), ২য় সং পৃঃ ১৯৬

২ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, পৃঃ ১৩৩

রামকৃষ্ণের বংশধরগণ সৈদাবাদে বাস করিয়া কৃষ্ণরায় এবং মোহনরায় বিগ্রহের সেবা করিয়া আসিতেছেন।[১]

পূর্বেই বলিয়াছি, রাধারমণ তৎকালে ছিলেন এই মোহনরায় বিগ্রহের সেবক। বিশ্বনাথ ইঁহারই গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার "স্তবামৃত-লহরীর" 'শ্রীগুরুচরণস্মরণাষ্টকম'-শীর্ষক স্তবে এই রাধারমণকেই 'গুরু' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন—

"শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ" -অর্থাৎ শ্রীরাধারমণ নামক গুরুর শ্রীচরণকমলে আমি ভূপতিত হইয়া আনন্দিত চিত্তে বন্দনা করিতেছি।

তাহা হইলে বিশ্বনাথের পরমগুরু হইলেন কৃষ্ণচরণ। "স্তবামৃত লহরীর" "পরমগুরুপ্রভুবরাষ্টকম্"-শীর্ষক স্তবে বিশ্বনাথ ইঁহারও উল্লেখ করিয়াছেন -

স্থিতিঃ সুরসরিত্তটে মদনমোহনজীবনং।
স্পৃহা রসিকসঙ্গমে চতুরিমা জনোদ্ধারণে॥
ঘৃণা বিষয়িষু ক্ষমা ঝটিতি যস্য চানুব্রজে।
স কৃষ্ণচরণপ্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম॥

অর্থাৎ গঙ্গাতীরে যাঁহার অবস্থান, শ্রীমদনমোহনই যাঁহার জীবন-ধন, রসিক ভক্তবৃন্দের সঙ্গসুখই যাঁহার কামনা, পতিত জনগণের উদ্ধার সাধনে যাঁহার দক্ষতা, বিষয়িগণে যাঁহার দয়া, আশ্রিতগণের প্রতি যিনি ক্ষমাশীল, সেই কৃষ্ণচরণ প্রভু আমাকে স্বপাদোদক-দানে অনুমতি করুন।

ইহা ব্যতীত ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের "সারার্থদর্শিনী" টীকার প্রারম্ভেও বিশ্বনাথ তাঁহার গুরু-পরম্পরার উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরুনুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীলনরোত্তমনাথঃ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥

১ নরোত্তমবিলাস, ১০, (বহরমপুর ২য় সং) পৃঃ ১৫০-১৫১

২ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান, পৃঃ ১৯৭৭

ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণ, এবং তদ্‌গুরু শ্রীগঙ্গাচরণ। "নাথ"-শব্দে শ্রীনরোত্তম-গুরু লোকনাথ গোস্বামী। ইহাই বিশ্বনাথের গুরুপরম্পরা। গুরুপরম্পরা ব্যতীত আচার্য বা গুরু স্বীকার্য নহে। সুতরাং বিশ্বনাথের গুরু রাধারমণ এবং পরমগুরু কৃষ্ণচরণ। কৃষ্ণচরণের গুরু গঙ্গানারায়ণ এবং তদ্‌গুরু নরোত্তম এবং তাঁহার গুরু লোকনাথ।

দীক্ষা গ্রহণের পর সৈদাবাদে মোহনরায়ের ঠাকুরবাড়ীতেই তিনি অবস্থান করিতেন এবং এখানে অবস্থানকালেই তিনি অলঙ্কার-কৌস্তুভের টীকা রচনা করেন। এই টীকার নাম—'সুবোধিনী।' গত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে সৈদাবাদে মোহনরায়ের ঠাকুরবাড়ীতে বিশ্বনাথের স্মৃতি-ফলক স্থাপিত হইয়াছে। স্মৃতি-ফলক[১]:

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর--

প্রকট কাল[২]:

শকাব্দা—১৫৬৫ --১৬৫২

বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াঽভবৎ॥

সৈদাবাদবাসি-শ্রীবিশ্বনাথাখ্য-শর্ম্মণা চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃত টীকা সুবোধিনী।

Here lived Pandit Beswanath The Great Vaisnab Luminary.

বাং—১৩৪৩

মুর্শিদাবাদ জিলার খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত পাতডাঙ্গা-নামক গ্রামে বিশ্বনাথ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

---

১ বর্তমান লেখকের—বৈষ্ণবাচার্য্য বিশ্বনাথ, পৃঃ ১২

২ প্রকটকাল সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই পাতডাঙ্গাতেই তিনি ইষ্টসাধনে সিদ্ধিলাভ করেন। বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল বিগ্রহও এখানে আছেন। সৈদাবাদে রচিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত কয়েকখানি টীকাও পাতডাঙ্গায় ছিল। এক বৈষ্ণববেশধারী ভক্ত সেগুলি পড়িবার নাম করিয়া লইয়া পরে একদিন গভীর রাতে অন্যত্র চলিয়া যান।[১] পাতডাঙ্গার চক্রবর্তিগণ বিশ্বনাথের ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন।

শোনা যায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামভদ্রের অনুমতি লইয়া বিশ্বনাথ পাতডাঙ্গা হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। নরোত্তমবিলাস পাঠে জানা যায় যে, তথায় গিয়া রাধাকুণ্ডের তীরে কবিরাজ গোস্বামীর ছাত্র পাঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণ মুকুন্দদাসের সহিত বসবাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে গুরুর আজ্ঞায় পুনরায় তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করেন। বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বেই তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া গুরুর আজ্ঞায় স্বীয় পত্নীর সহিত এক রাত্রি মাত্র যাপন করেন; কিন্তু সারারাত পত্নীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা-আলাপনে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে তিনি চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান।

বৃন্দাবনে ফিরিয়া পুনরায় রাধাকুণ্ডের সমীপেই তিনি অবস্থান করেন এবং এখানে থাকিয়াই তিনি তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন—

> করিলেন বাস রাধাকুণ্ডসমীপেতে।
> বর্ণিলেন বহু গ্রন্থ ব্যাপিল জগতে॥[২]

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভাগবতের টীকা রচনার পর কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্বনাথ নিত্যধামে গমন করেন। বৃন্দাবনের পাথরপুরায় তাঁহার সমাধি ছিল, পরে তাহা গোকুলানন্দে স্থানান্তরিত করা

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—"পদ-কর্তা হরিবল্লভ"—শীর্ষক প্রবন্ধ (আনন্দ বাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৯)।

২ নরোত্তমবিলাস, বহরমপুর, ২য় সং (গ্রন্থকর্তার পরিচয়) পৃঃ ২০১

হয়।[1] শোনা যায়, শেষ জীবন গোবর্ধনের নিকট আরিটগ্রামে কবিরাজ গোস্বামীর ছাত্র মুকুন্দদাসের সঙ্গে একই কুটিরে তিনি বাস করিতেন এবং এই কুটিরেই তিনি শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ বর্তমানে বৃন্দাবনে রক্ষিত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলী

১। সারার্থদর্শিনী—ভাগবতের টীকা। হরিদাস দাস শ্রীশ্রী-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে (২য় খণ্ড পৃঃ ১১৬) লিখিয়াছেন—"এ পর্য্যন্ত শ্রীভাগবতের ১৩০টি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আমরা যতগুলি টীকা (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) দেখিবার সুযোগ-সৌভাগ্য পাইয়াছি, তাহাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শ্রীপাদ সনাতনের বৈষ্ণব-তোষণী এবং শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থদর্শিনীই সর্ব্বোচ্চ স্থানের দাবী করিতে পারে।" রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া ১৬২৬ শকাব্দে (১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে) মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে এই টীকা সমাপ্তি হয় বলিয়া বিশ্বনাথ বলিয়া গিয়াছেন—

ঋত্বক্ষিষড় ভূমিমিতে শাকে রাধাসরস্তটে।
শুক্লষষ্ঠাং সিতে মাঘে টীকেয়ং পূর্ণতামগাৎ॥

২। সারার্থবর্ষিণী—গীতার টীকা।

৩। সুবোধিনী—কবিকর্ণপূর-রচিত অলঙ্কার কৌস্তুভের টীকা। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সৈদাবাদে অবস্থানকালেই বিশ্বনাথ এই টীকা রচনা করেন।

৪। সুখবর্তনী- কবিকর্ণপূর-রচিত আনন্দবৃন্দাবন চম্পূর টীকা।

৫। বিদগ্ধ মাধব নাটক বিবৃতি—রূপ গোস্বামিরচিত বিদগ্ধ-মাধবের এই টীকা বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত-সংস্করণে বিশ্বনাথের নামে দেখা যায়। হরিদাস দাস ইহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার রচয়িতা কৃষ্ণদাস সার্বভৌম।[2]

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, পৃঃ ১৩৪

২ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য, পৃঃ ১১৮

৬। **আনন্দ চন্দ্রিকা**—রূপ গোস্বামি-রচিত উজ্জ্বলনীলমণির টীকা।

৭। **মহত্তা**—রূপ গোস্বামি-রচিত দানকেলি-কৌমুদীর টীকা। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেন[১] যে, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দান-কেলি-কৌমুদী নাটকের প্রচ্ছদপটে এই টীকা শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত বলিয়া জানাইলেও এ বিষয়ে আভ্যন্তরীণ কোন প্রমাণ নাই। হরিদাস দাসও বলেন যে, বহরমপুর সংস্করণে টীকাটি শ্রীজীবের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও সংস্কৃত কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং পুণা ভাণ্ডারকর অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থ-তালিকায় এই টীকা (মহত্তা) বিশ্বনাথের নামেই দেখা যায়।[২] কাজেই এই টীকা বিশ্বনাথের রচনা বলিয়াই মনে হয়।

৮। **ললিত-মাধব-নাটক টিপ্পনী** - এই টীকা বিশ্বনাথের রচনা বলিয়া অনেকের ধারণা। তবে ইহা যথার্থই বিশ্বনাথের রচনা কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। টীকার আদি বা অন্তে কোন স্থানে কোনরূপ বর্ণনা বা পুষ্পিকাদি নাই। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ললিতমাধব নাটক টীকা-সহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও টীকাটি কাহার রচিত তাহা বলেন নাই। টীকার প্রথমে "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-কৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-চরণৈর্মদেক-শরণৈঃ" পাঠ দেখিয়া ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন, ইহা শ্রীজীব গোস্বামীর রচনা।

৯। **ভক্তিসার-প্রদর্শনী**—রূপ গোস্বামি-রচিত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর টীকা।

১০। **গোপালতাপনীর টীকা**—কাহারও কাহারও মতে বিশ্বনাথের এই টীকার নাম—"ভক্তহর্ষিণী।"

১১। **ব্রহ্মসংহিতার টীকা।**

---

১ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ১৫২

২ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, পৃঃ ১৭৬

১২। **প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকার টীকা**—বিশ্বনাথ সংস্কৃতে নরোত্তম-রচিত 'প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা'র টীকা রচনা করিয়াছেন।

১৩। **চৈতন্যচরিতামৃতের টীকা**—কলিকাতা রাধাবাজার হইতে মাখনলাল দাস কর্তৃক প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃতের একটি টীকা আছে। ইহাতে মঙ্গলাচরণ, পুষ্পিকাবাক্য প্রভৃতি কিছুই নাই।[১]

১৪। **হংসদূত-টীকা**—রূপ গোস্বামি-রচিত হংসদূতের টীকা। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পুঁথিতে আছে (R. L. Mitra's 'Notices' IX. P. 57, No. 2947)[২]

১৫-১৮। **ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, উজ্জ্বলনীলমণিকিরণম্, রাগ-বর্ত্মচন্দ্রিকা, মাধুর্য্যকাদম্বিনী**—এই গ্রন্থ চতুষ্টয়ে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির সংক্ষিপ্তসার বিবৃত হইয়াছে।

১৯। **ভাগবতামৃতকণা**—রূপ গোস্বামি-রচিত লঘু ভাগবতামৃতের সার-সঙ্কলন।

২০। **ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী**—মাধুর্যকাদম্বিনীর দ্বিতীয় অমৃতবৃষ্টিতে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

২১। **কৃষ্ণভাবনামৃত**—এই গ্রন্থে রাধাগোবিন্দযুগলের অষ্ট-কালীয় লীলার বর্ণনা আছে। প্রায় প্রত্যেক লীলাতেই রাধা-গোবিন্দযুগলের একবার মিলন বর্ণনাও এই গ্রন্থের অন্যতম বিশেষত্ব। ১৬০১-শকে (১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) ইহা রচিত বলিয়া গ্রন্থ শেষে প্রকাশ।

২২। **চমৎকার-চন্দ্রিকা**—এই গ্রন্থ চারি "কুতূহল"-নামক অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। কথিত আছে, হরিবাসরে রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে চারি যামের জন্য চারিটি "কুতূহল" লিখিত হইয়াছে এবং পূর্বকালে বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আপন আপন

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য, পৃঃ ১২০

২ ঐ, পৃঃ ১১৯

অনুভব-চমৎকারিতার আদান-প্রদানে ইষ্টগোষ্ঠীতে পরমানন্দ লাভ করিতেন।[১]

২৩। **ব্রজরীতিচিন্তামণি**—ব্রজ-মণ্ডলের কোন্ দিকে শ্রীকৃষ্ণের কোন্ লীলাস্থলী বিরাজমান, তাহারই পরিচয় আছে এই গ্রন্থে।

২৪। **প্রেম-সম্পুট**—এই গ্রন্থে রাধা-প্রেমের একটি নিখুঁত বর্ণনা আছে। রচনাকাল—১৬০৮শক (১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

২৫। **শ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীয়-স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্**—গৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ বিষয়ে ১১টি শ্লোকে রচিত। বিশ্বনাথের শিষ্য বলিয়া কথিত কৃষ্ণদাস দাস ইহা পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদটির নাম—'শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত'। ইহা বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে ৪০১ চৈতন্যাব্দে প্রথম প্রকাশিত।[২]

২৬। **গৌরগণোদ্দেশচন্দ্রিকা**—এই গ্রন্থে রাঢ়ের বাসুদেব, বিষ্ণুদাস প্রভৃতির নিজ ঈশ্বরত্ব স্থাপনে চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বনাথের রচিত "গৌরগণস্বরূপতত্ত্ব-চন্দ্রিকা" নামে অপর একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া হরিদাস বাবাজী জানাইয়াছেন।[৩]

২৭। **স্তবামৃত লহরী**—ইহাতে নিম্নলিখিত ২৮টি স্তব আছে—(১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্, (২) শ্রীগুরুচরণস্মরণাষ্টকম্, (৩) শ্রীপরমগুরুপ্রভুবরাষ্টকম্, (৪) শ্রীপরাৎপর শ্রীগুরুগঙ্গানারায়ণাষ্টকম্, (৫) শ্রীনরোত্তমপ্রভুরষ্টকম্, (৬) শ্রীলোকনাথাষ্টকম্, (৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্, (৮) শ্রীস্বরূপচরিতামৃতম্, (৯) শ্রীশ্রীস্বপ্ন বিলাসামৃতম্, (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টকম্, (১১) শ্রীমদনগোপালদেবাষ্টকম্, (১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্, (১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টকম্, (১৪) শ্রীগোকুলানন্দগোবিন্দাষ্টকম্, (১৫) স্বয়ংভগবত্তাষ্ট-

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১৩৮

২ ঐ, (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ১২৭ এবং ১৪৬

৩ ঐ, (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ১৪৬

কম্, (১৬) জগন্মোহনাষ্টকম্, (১৭) অনুরাগবল্লী, (১৮) শ্রীবৃন্দাষ্টকম্, (১৯) শ্রীরাধাধ্যানম্, (২০) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (২১) শ্রীসঙ্কল্প-কল্পদ্রুম্, (২২) নিকুঞ্জকেলি বিরুদাবলী, (২৩) শ্রীস্বরথকথামৃতঃ, (২৪) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (২৫) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (২৬) শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্, (২৭) শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডাষ্টকম্, (২৮) গীতাবলী—ইহাতে ১১টি গীত আছে।

২৮। **ক্ষণদাগীতচিন্তামণি** – পদকর্তারাই তাঁহাদের উন্নত রস-বোধ লইয়া সাধন-ভজনের উপযোগী পদাবলী সংগ্রহ করিতেন। তাঁহারা রস-পর্যায় অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া পদাবলীর সংকলন করিতেন। এইরূপ পদাবলী-সংগ্রহের মাধ্যমেই বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য সুসজ্জিত হইয়া আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' এই জাতীয় প্রাচীন পদ-সংগ্রহ। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন যে "রাত্রিতে ভগবানের নাম-কীর্তন যাহাতে ভক্তগণের আস্বাদ্যরূপে নির্বাহিত হয় তাহার জন্য তিনি প্রতিপদ হইতে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত ৩০ রজনীর মতো পালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে রসের বিভাগ সম্বন্ধে যে জ্ঞান-লাভ করা যায়, অন্যত্র তাহা সুলভ নহে।"[১]

কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা এবং শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এক চান্দ্র মাসের ৩০টি পালা এই গ্রন্থে আছে বলিয়াই এই গ্রন্থের নাম--'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'। এক একটি পালাকে এক একটি ক্ষণদা বলা হয়।

সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই বিশ্বনাথ ক্ষণদাগীতচিন্তামণি সংকলন করেন। ইহার পূর্বেও পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৫৬৫ শকে বা ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস কীর্তনের রস-পর্যায়ের একখানি পদ-

১ বর্তমান লেখকের বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ (রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত 'পরিচায়িকা' পৃঃ ৶৴

সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন—নাম "রাধাকৃষ্ণ-রস-কল্পবল্লী"। কাজেই পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে এই খানিকেই সর্বপ্রথম গ্রন্থ বলিতে হয়। ইহার পর সপ্তদশ শতকেই রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর দাস এই গ্রন্থের পরিপূরকরূপে "রসমঞ্জরী" নামে একখানি পদ-সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন এবং কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া খ্যাত মুকুন্দদাস 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে' কিছু পদ-সংকলন করেন।[১] তবে এত অধিক সংখ্যক পদ ইহার পূর্বে সম্ভবতঃ আর কাহারও গ্রন্থে সংকলিত নাই। কাজেই এদিক দিয়া বিচার করিলে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি প্রাচীন পদ সংকলন গ্রন্থের মধ্যে বোধহয় প্রথম সর্ব-বৃহৎ গ্রন্থ।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণির পূর্ব-বিভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। হরিদাস দাস লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থের উত্তরার্ধের সপ্তদশ ক্ষণদা পর্যন্ত বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবাইত অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর নিকট এবং পশ্চিম বিভাগ ঐ স্থানের নিম্বার্ক-গ্রন্থালয়ে রক্ষিত আছে।[২]

ক্ষণদাগীতচিন্তামণির পূর্ব-বিভাগে ৩১০টি পদ আছে। ইহার মধ্যে বিশ্বনাথ হরিবল্লভ বা বল্লভ নাম দিয়া—৫১টি পদ রচনা করিয়াছেন।

বিশ্বনাথের নিজের রচিত পদগুলিও বড় সুন্দর। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল—

১

শ্রীগৌরচন্দ্র[৩]

দেখ দেখ সোই মূরতিময় মেহ।
কাঞ্চন কাঁতি সুধা জিনি মধুরিম
নয়ন-চষক ভরি লেহ॥

১ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ,—॥৫/৮/.

২ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১৪৮৪

৩ এই পদটি প্রথম ক্ষণদার গৌরচন্দ্র

শ্যামল[1] বরণ মধুররস ঔষধি
পূরব যো গোকুল মাহ।
উপজল জগত যুবতী উমতাওল
যো সৌরভ পরবাহ॥
যো রস বরজ গোরী কুচমণ্ডল
মণ্ডনবর করি রাখি।
তে ভেল গৌর গৌড় অব আওল
প্রকট প্রেমসুরশাখী॥
সকল ভুবন সুখ কীর্ত্তন সম্পদ
মত্ত রহল দিন রাতি।
ভবদব কোন কোন কলিকল্মষ
যাঁহা হরিবল্লভ ভাঁতি॥[2]

ব্যাখ্যা—সেই মূর্তিময় জলধরকে একবার দেখ, দেখ। ইহার অমৃত-বিনিন্দিত মাধুর্যময় কান্তি নয়নরূপ পান-পাত্রে পূর্ণ করিয়া গ্রহণ কর। মেঘের রং শ্যামল। তবে ইহার সোনার বর্ণ হইল কি করিয়া? তাহার কারণ বলিতেছি। পূর্বে গোকুলে উদিত হইয়া শ্যামজলধর যে সুধা-সুমধুর সঞ্জীবন ঔষধি বর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহার সৌরভপ্রবাহ জগতের যুবতীমণ্ডলীকে পাগলিনীপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, যে রসরূপ মৃগমদ ব্রজরমণীগণ নিজ নিজ স্তনযুগলে শ্রেষ্ঠ অনুলেপনরূপে মণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই মেঘই শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি গায়ে মাখিয়া ব্রজরমণীগণের প্রেমনির্যাসরূপে গৌর হইয়া গৌড়মণ্ডলে আসিয়া প্রেমকল্পতরু রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। সেই গৌরসুন্দর দিনরাত হরি-কীর্তনে মাতিয়া আছেন। শ্রীহরি যেখানে বল্লভরূপে প্রকাশিত (পদ-কর্তা হরিবল্লভ যেখানে হরি গুণগানে রত), সেখানে ভব-দাবানল এবং কলির পাপরাশি উভয়ই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

---

১ পাঠান্তর—শ্যামর

২ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—বৈষ্ণব পদাবলী (১৯৬১), পৃঃ ৮০৩

২

শ্রীরাধার প্রতি সখী

সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
তুয়া অনুরাগ তরঙ্গিণী রঙ্গিণী
কোন করব অব বন্ধ॥
ধৈরজ লাজ কুলতরু ভাঙ্গই
লঙ্ঘই গুরু গিরি রোধে।
মাধব কেলি সুধারস সাগরে
লাগত বিগত বিরোধে॥
করু অভিসার হার মণিভূষণ
নীলবসন ধরু অঙ্গে।
এ সুখযামিনী বিলসহ কামিনী
দামিনী জনু ঘন সঙ্গে॥
তুয়া পথ চাই রাই রাই বলি
গদগদ বিকল পরাণ।
ক্ষণ এক কোটি কোটি যুগ মানত
হরিবল্লভ পরমাণ[১]॥

ব্যাখ্যা ঃ—সজনি, এতদিনে আমার সংশয় দূর হইল। রঙ্গিণি, তোমার অনুরাগ তরঙ্গিণীকে এখন কে বন্ধ করিবে? ধৈর্য ও লাজরূপ তীর তরুদলকে ভাঙিয়া গুরু-গৌরবরূপ পর্বতের অবরোধ-লঙ্ঘন করিয়া। তোমার অনুরাগ ধারা এখন সকল বিঘ্ন মুক্ত হইয়া মাধবের কেলি-রস সাগরে মিলিত হউক। তাই বলিতেছি, এখন অভিসারে চল, অভিসারের উপযোগী মণিহার-ভূষণে অঙ্গ সজ্জিত কর, নীল-বসন পরিধান কর। কামিনি, এই সুখ-রজনীতে মেঘের সঙ্গে দামিনীর মতো শ্যাম-অঙ্গে মিলিত হও। তোমার পথ চাহিয়া

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—বৈষ্ণব পদাবলী (১৯৬১), পৃঃ ৮০৬

শ্যাম গদ্‌গদ বচনে সংকেত কুঞ্জে 'রাই রাই' বলিয়া বিলাপ করিতেছে। তোমার একপদ বিলম্বকে তাহার কোটি কোটি যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার প্রমাণ—পদকর্তা হরিবল্লভ।

৩

শ্রীরাধার প্রতি সখীর অনুরোধ

সুন্দরি কলয় সপদি নিজ চরিতম।
ত্বমতনুকর্ম্মণি বিদুষি রসিকমমু
মাকর্ষসি গুণ কলিতম্॥
নিজ মন্দির মনু পদলসদিন্দির-
মপি পরিহায় বিলাসী।
অভবদপাস্ত স- মস্ত কলং গিরি
কন্দর তটবন বাসী॥
ভবদনুরাগ নৃ- পতিকৃত হা কিম্
কারণ বৈরমপারম্।
প্রহরতি মন সিজ ধনুরমুনা প্রহি-
তং যদমুং কতিবারম্॥
জীবয়িতুং যদি কান্তমনন্ত-
গুণালয়মিচ্ছসি কান্তে।
অভিসর সংপ্রতি তং প্রতি ভামিনি
হরিবল্লভ-ভণিতান্তে[১]॥

ব্যাখ্যা :—সুন্দরি, তোমার নিজের স্বভাবের কথা একবার বিচার করিয়া দেখ। যে স্বভাবের দ্বারা তুমি রসিকেন্দ্র চূড়ামণি ব্রজ-যুবরাজকে (অর্থাৎ সর্বাকর্ষক কৃষ্ণকে) সর্বদাই আকর্ষণ করিতেছ, সেই স্ব-ভাব তথা স্ব-ভাব-জাত গুণের কথা একবার মনে করিয়া দেখ। যাহার নিজ মন্দিরে মহালক্ষ্মীর লীলানিকেতন, তোমার অঙ্গ-সঙ্গের

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—বৈষ্ণব পদাবলী (১৯৬১), পৃঃ ৮১৪-১৫

লোভে সেই বিলাসী রাজনন্দন সকল সুখ ত্যাগ করিয়া গিরি-গোবর্ধনের বনে আসিয়া বাস করিতেছে। কিন্তু তাহাকে বনে পাঠাইয়াও তোমার অনুরাগরূপ মহারাজ ক্ষান্ত হয় নাই, অনবরত বৈর-নির্যাতনের জন্য মদন শরাঘাতে জর্জরিত করিতেছে। পদকর্তা হরিবল্লভ বলিতেছেন, হে কান্তে, অনন্ত গুণের আকর সেই কান্তকে যদি বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে এখনই আমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিকট অভিসার কর।

৪

শ্রীরাধার অভিসার

ধনি ধনী রাধা শশী বদনী
লোচন অঞ্চল চকিত চলত মণি
কুন্তল অলগনি ঝলক বনি ॥
মন্দ সুগন্ধ সুশীতল মারুত
ঘুংঘট অঞ্চল নটই রসে।
নাসা মোতিম উড জনু খেলত
বিম্বাধর পর হসনি লসে ॥
উর মণিহার তরঙ্গিণী সঙ্গত
কুচযুগ কোক সদা হরিষে।
রাজহংস সম গমন মনোরম
বল্লভ লোচন সুখ বরিষে ॥[১]

ব্যাখ্যা ঃ—ধন্য চন্দ্র বদনী রাধা। শ্রীরাধার নয়নাঞ্চল এবং চঞ্চল মণিকুণ্ডল পরস্পর সংলগ্ন হইতেছে না, অথচ অপরূপ ঝলক দিতেছে। সুগন্ধ, সুশীতল, মন্দ-পবন তাহার মস্তকের বসনাঞ্চল যেন রস-ভারে নাচাইতেছে। নাসায় পরিহিত নোলকের উপরের মুক্তা যেন নক্ষত্রের মতো হাস্য-লাস্য মণ্ডিত বিম্বাধরের উপর খেলা

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—বৈষ্ণব পদাবলী (১৯৬১), পৃঃ ৮০৮

করিতেছে। বক্ষের মণিহার যেন নদীর প্রবাহ। সেই প্রবাহে স্তনরূপ চক্রবাকযুগল যেন সর্বদাই আনন্দে মিলিত রহিয়াছে। শ্রীরাধারাণীর চলন-ভঙ্গি রাজহংসের মতো মনোরম। পদকর্তা বল্লভের চক্ষে তাহা সুখবর্ষণ করিতেছে।

উপরে বিশ্বনাথের যে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে দেখা যায় যে, রাধা-কৃষ্ণের মিলন-মাধুরীর দিকেই তাঁহার ঐকান্তিক আবেশ। ইহাতে তাঁহার সিদ্ধ দশার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বলদেব বিদ্যাভূষণ

বৃন্দাবনে বলদেব বিদ্যাভূষণ ছিলেন বিশ্বনাথের যোগ্য সহচর।

উড়িষ্যার বালেশ্বর জিলায় রেমুণার নিকটে কোন গ্রামে খণ্ডায়েৎ বৈশ্য-সমাজের এক কৃষক পরিবারে বলদেব জন্মগ্রহণ করেন।[১] হরিদাস দাস লিখিয়াছেন যে, আনুমানিক অষ্টাদশ শতকে বলদেবের জন্ম।[২] ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কেননা বলদেব ছিলেন বিশ্বনাথের সহচর। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের টীকা সমাপ্ত করিবার পর কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্বনাথের তিরোভাব। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই বিশ্বনাথের তিরোভাব হইয়াছে। এক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকে যদি বলদেব জন্মগ্রহণ করেন, তবে তিনি বৃন্দাবনে বিশ্বনাথের সহচর হইতে পারেন না।

গলতায় বিচার-সভার অধিবেশন হয় ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিচার-সভায় যোগদান বলদেবের জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। অষ্টাদশ শতকে জন্ম হইলে অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই অর্থাৎ ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বলদেবের পক্ষে বিচার-সভায় যোগদান সম্ভবপর হয় না। কাজেই সপ্তদশ শতকের শেষপাদে বলদেবের আবির্ভাবকাল ধরিতে হয়। এই অনুমান ব্যতীত এ সম্বন্ধে সঠিক কাল নির্ণয়ের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই।

---

১ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত সিদ্ধান্তরত্নম্ (২য় খণ্ড)—Introduction, পৃঃ ২

২ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১২৯২

হরিদাস দাস লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার চিল্কা-হ্রদের তীরে কোন স্থানে থাকিয়া বলদেব ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বেদ পড়িবার জন্য তিনি মহীশূরে গমন করেন। এই সময়ে তিনি মাধব-সম্প্রদায়ের শিষ্য হন এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের পণ্ডিত-সমাজকে শাস্ত্র-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তত্ত্ববাদি মঠে অবস্থান কবিতে থাকেন।[১] পরে পীতাম্বর দাস নামে এক বৈরাগীর নিকট তিনি ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং "বেদান্ত স্যমন্তকে"র বহু বিখ্যাত গ্রন্থকার, কনৌজ ব্রাহ্মণ রাধাদামোদর দাসের নিকট গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহাকে গুরু ধরিলে বলদেবের নিম্নলিখিতরূপ গুরু-পরম্পবা পাওয়া যায়—

(১) নিত্যানন্দ
|
(২) গৌরীদাস পণ্ডিত (শিষ্য)
|
(৩) হৃদয় চৈতন্য (শিষ্য)
|
(৪) শ্যামানন্দ (শিষ্য)
|
(৫) রসিকমুরারি (শিষ্য)
|
(৬) রাধানন্দ (পুত্র এবং শিষ্য)
|
(৭) নয়নানন্দ (রাধানন্দের পুত্র এবং রসিকমুরারির শিষ্য)
|
(৮) রাধাদামোদর (শিষ্য)
|
(৯) বলদেব বিদ্যাভূষণ (শিষ্য)

---

১ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১২৯২

২ মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত—সিদ্ধান্তরত্নম্, ২য় খণ্ড—'Introduction', পৃঃ ২

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর বলদেব বৃন্দাবনে গিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সহিত মিলিত হন। ষড়-গোস্বামিগণের পরে বৃন্দাবনের অবস্থা দিন-দিনই মলিন হইয়া পড়ে। বিশ্বনাথ ও বলদেব উভয়ে মিলিয়া বৃন্দাবনের সেই পূর্ব-গৌরব ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হন।

বলদেব অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। রূপ গোস্বামীর 'স্তবমালা'র যে টীকা তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহার রচনাকাল ১৬৮৬ শক (১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহার পর বলদেব আর কোন গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া জানা যায় না বা তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন কথা শোনা যায় না। তাই মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ বলেন যে, বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত প্রকট ছিলেন।[১]

বলদেবের শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে নন্দ মিশ্র এবং উদ্ধবদাস সমধিক প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থাবলী

১। গোবিন্দভাষ্য—বলদেবের রচনাব মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এখানি ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য। এই ভাষ্য রচনার পশ্চাতে আছে ঘটনাচক্রের এক জোর তাগিদ।

শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ জয়পুরে গিয়া বাঙালী সেবায়েতগণকে অসম্প্রদায়ী বলিয়া বিবেচনা করায় জয়পুরের মন্দিরসমূহ হইতে তাঁহারা সেবাচ্যুত হন। বৃন্দাবনে এই সংবাদ আসিলে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর আদেশে বলদেব জয়পুরে গলতা নামক পর্বত-সঙ্কুল প্রদেশে গিয়া বিপক্ষগণকে তর্কে পরাস্ত করিলে তাঁহারা ব্রহ্ম-সূত্রের সম্প্রদায়োচিত 'ভাষ্য' দেখিতে চান। তখন বলদেব ব্রহ্ম-সূত্রের

---

১ সিদ্ধান্তরত্নম, ২য় খণ্ড, (Introduction) পৃঃ ৩

২ ঐ (Introduction) পৃঃ ৩

৩ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৪

এই ভাষ্য রচনা করেন। অবশ্য রূপ-সনাতন প্রভৃতি পূর্বে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও ব্রহ্ম-সূত্রের উপর তাঁহারা কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই। ইহার যথেষ্ট সঙ্গত কারণও ছিল ; ইঁহাদের মতে ভাগবতই ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ।[১] এই জন্যই ইঁহারা ব্রহ্ম-সূত্রের আর কোন ভাষ্য রচনা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু এখন প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় বলদেব এই ভাষ্য রচনা করেন।

শ্রীগোবিন্দের স্বপ্নাদেশ পাইয়া বলদেব এই ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাই গ্রন্থের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—

বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যোমামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥

ইহার টীকায়ও আছে—

"গোবিন্দ নিরূপকত্বাদ্ গোবিন্দেন প্রযোজকেন সিদ্ধত্বাদ্ বা গোবিন্দেন গোবিন্দভাষ্যমিত্যুক্তং।" অর্থাৎ এই ভাষ্য "গোবিন্দ-তত্ত্ব" নির্ণায়ক বা গোবিন্দই ইহার প্রযোজক। এই জন্য ইহার নাম — "গোবিন্দভাষ্য।"

এই গ্রন্থের 'সূক্ষ্মা' নামক টীকাও বলদেবেরই রচিত।

২। **সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক**—এই গ্রন্থ "গোবিন্দভাষ্যে"র ভূমিকাস্বরূপ। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্-সন্দর্ভাদি-পাঠে যাঁহারা অক্ষম, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইতে পারেন।[২] এই গ্রন্থের আটটি পাদ (অধ্যায়) আছে। প্রথম পাদে—জীবের পরম পুরুষার্থ, দ্বিতীয়ে —ভগবানের ঐশ্বর্য, তৃতীয়ে—শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ব, চতুর্থে—তাঁহার সর্ববেদবেদ্যত্ব, পঞ্চমে ও ষষ্ঠে—কেবলাদ্বৈতবাদ-নিরাস, সপ্তমে— কেবলানুভূতি মতের খণ্ডন এবং অষ্টমে—পরম পুরুষার্থের সিদ্ধান্ত-

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৪

২ সিদ্ধান্তরত্নম্ (১ম খণ্ড)—Prefatory Note

পক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। 'ভাষ্য-পীঠক' নামকরণের হেতুও বলদেব গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

যদ্ব্রহ্মসূত্রেষু বিভাতি ভাষ্যং
কৃষ্ণাত্মকং ব্যক্তনবপ্রমেয়ম্।
তস্যোপবেশায় সুবর্ণপীঠং
সিদ্ধান্তরত্নং ন ভবেৎ কিমেতৎ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম-সূত্রে হরিপারতম্যাদি নব-প্রমেয়যুক্ত কৃষ্ণাত্মক (গোবিন্দ) ভাষ্য-বিরাজিত আছে, তাহারই উপবেশনের জন্য এই সিদ্ধান্তরত্ন নামক সুবর্ণ-পীঠই যোগ্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, এই গ্রন্থে যে সব শ্রুতি প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত "গোবিন্দ ভাষ্যের" পরিপুষ্টি হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্ত রত্নাবলী সম্যক্ অনুধাবন করিয়া গোবিন্দভাষ্য অধ্যয়ন করিলে অবশ্যই সুফল-লাভ হয়।

ইহার টীকাও বলদেবেরই রচিত।

৩। প্রমেয় রত্নাবলী—মধ্বাচার্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার মতের নয়টি 'প্রমেয়' স্বীকৃত ও বিচারিত হইয়াছে। এক একটি অধ্যায়ে এক একটি প্রমেয় দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম প্রমেয়—শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব।

দ্বিতীয় প্রমেয়—শ্রীহরির অখিলাম্নায়বেদ্যত্ব।

তৃতীয় প্রমেয়—বিশ্বসত্যত্ব।

চতুর্থ প্রমেয়—ভেদসত্যত্ব।

পঞ্চম প্রমেয়—ভগবদ্দাসত্ব।

ষষ্ঠ প্রমেয়—জীবতারতম্যত্ব।

সপ্তম প্রমেয়—কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভই মোক্ষ।

অষ্টম প্রমেয়—অমল কৃষ্ণভজনেই মোক্ষ।

নবম প্রমেয়—প্রমাণত্রয়। তিন প্রকার প্রমাণই গ্রাহ্য—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ।

এই গ্রন্থের টীকা 'কান্তিমালা'ও বলদেবেরই রচিত। মতান্তরে ইহার রচয়িতা—কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ (সার্বভৌম)।

৪। **গীতাভূষণ**—গীতার ভাষ্য।

৫। **বৈষ্ণবানন্দিনী**—ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা।

৬। **গোপালতাপনীর ভাষ্য**—বলদেব এই উপনিষদের ভাষ্যে দার্শনিক বিচারও করিয়াছেন।[১]

৭। **ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য**—হরিদাস দাস লিখিয়াছেন যে, বলদেব ঈশাদি-দশোপনিষদের ভাষ্য-রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঈশোপনিষদের ভাষ্য ছাড়া অন্যগুলি পাওয়া যায় না।

৮। **সারঙ্গরঙ্গদা**—রূপগোস্বামীর লঘুভাগবতামৃতের টীকা।

৯। **তত্ত্বসন্দর্ভ টীকা**—শ্রীজীব গোস্বামীর "তত্ত্বসন্দর্ভের" টীকা।

১০। **নাটক-চন্দ্রিকা টীকা**—শ্রীরূপ গোস্বামীর "নাটক চন্দ্রিকার" টীকা। এই টীকা দুষ্প্রাপ্য।[২]

১১। **স্তবমালার ভাষ্য** -শ্রীজীব-কর্তৃক সংকলিত রূপগোস্বামীর "স্তবমালার" ভাষ্য।

১২। **ছন্দঃকৌস্তুভ ভাষ্য**—বলদেব তাঁহার গুরু রাধাদামোদরের "ছন্দঃকৌস্তুভের" এই ভাষ্য রচনা করেন।

১৩। **শ্রীশ্যামানন্দশতকের টীকা**—শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ-বিরচিত "শ্রীশ্যামানন্দ-শতকমে"র টীকা।

১৪। **চন্দ্রালোক টীকা**—জয়দেব-কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থ "চন্দ্রালোকে"র টীকা। এই টীকা দুষ্প্রাপ্য।[৩]

১৫। **সাহিত্য-কৌমুদী**—"ভরতমুনি-কৃত সূত্রাবলম্বনে ও কাব্য প্রকাশ-নামক অলঙ্কার-শাস্ত্রের মূল কারিকাসমূহের বৃত্তিই—এই সাহিত্যকৌমুদী।"

১ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০

২ ঐ, পৃঃ ১২২

৩ ঐ, পৃঃ ১২৩

১৬। **নামার্থ সুধা**—মহাভারতে বিষ্ণুর সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, তত্ত্ব-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ (শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি) গীতা ও সহস্র নাম হইতে নিজ নিজ মত সমর্থন করিতে না পারিলে সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকতা স্থাপন করিতে পারেন না। এইজন্য শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ এই দুই গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বলদেবও সহস্র নামের ভাষ্যরূপে এই "নামার্থ সুধা" রচনা করিয়াছেন।

১৭। **সিদ্ধান্ত-দর্পণ**—বলদেব-রচিত এই গ্রন্থের সাতটি প্রভা (অধ্যায়)।

প্রথম প্রভা—বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন।

দ্বিতীয় প্রভা—ব্যাসদেব-বিরচিত পুরাণাদির অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপন।

তৃতীয় হইতে সপ্তম প্রভা—ভাগবতের বিরুদ্ধে অন্যত্র যেসব মতবাদ আছে তাহার খণ্ডন করিয়া এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন।

১৮। বলদেব-রচিত একটি মাত্র 'পদ' 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত আছে (২৮৪৩)। পদটি নিম্নে দেওয়া হইল—

জয় জয় মঙ্গল আরতি দুহুঁকি।
শ্যাম-গৌরী ছবি উঠই ঝলকি॥
নবঘনে জনু থির বিজুরি বিরাজে।
তাহে মণি-আভরণ অঙ্গহি সাজে॥
করে লই দীপাবলী হেম-থারী।
আরতি করতহিঁ ললিতা আলী॥
সবহুঁ সখীগণ মঙ্গল গাওয়ে।
কোই করতালি দেই, কোই বাজাওয়ে॥
কোই কোই সহচরী মনহিঁ হরিখে।
দুহুঁক অঙ্গপর কুসুম বরিখে॥
ইহ রস কহতহিঁ বলদেব দাসে।
দুহুঁরূপ মাধুরী হেরইতে আশে॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাঙলাদেশের অবস্থা

সূচনা

বৃন্দাবনে বিশ্বনাথ-বলদেব যখন নব-উদ্দীপনায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে রত, বাঙলাদেশেও তখন বৈষ্ণবধর্মের স্রোত সমানভাবেই প্রবহমান ছিল। শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দ (নামান্তর গোবিন্দগতি) ছিলেন সুপণ্ডিত এবং আদর্শ বৈষ্ণব। ইনি বীরচন্দ্র-চরিত অবলম্বনে "বীর রত্নাবলী" নামে গ্রন্থ রচনা করেন।[১]

দেশে বৈষ্ণবানুষ্ঠান হইত। দিবা-রাত্রি সংকীর্তন হইত এবং সংকীর্তনের শেষে দেবতাকে ভোগ অর্পণের পর প্রসাদ বিতরণ করা হইত।

মুসলমানগণ হিন্দুর ধর্ম-কর্মে কোনরূপ বাধা দিতেন বলিয়া জানা যায় না। এই সময়ই মুর্শিদাবাদে বাঙলার রাজধানী স্থাপিত হয় এবং বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের নবতম সূচনা দেখা দেয়। ইহা হইতেছে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগের কথা। আবার এই যুগেই দুইজন বৈষ্ণবাচার্য বাঙালীর বৈষ্ণবধর্মে নূতন প্রেরণা দান করেন। ইঁহাদের একজন হইতেছেন নরহরি এবং দ্বিতীয় জন—রাধামোহন।

নরহরি

মুর্শিদাবাদ জিলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথী তাঁহার রেঁয়াপুর গ্রামে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ব্রাহ্মণ-বংশে নরহরির জন্ম।[২] তাঁহার আর এক নাম ঘনশ্যাম। নরহরি তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮

২ নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, (বঙ্গাব্দ-১৩০৯) পৃঃ ৬২৮

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে—জানে সর্ব্বজনে।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি—কি হেতু হইল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নরহরির পিতার নাম জগন্নাথ এবং তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। নরহরি যে সংসার-বিরাগী ছিলেন, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়।

হরিরাম আচার্য বংশীয় রামনিধির পুত্র নৃসিংহ চক্রবর্তী নরহরির দীক্ষাগুরু। নরহরির নিজের উক্তি হইতে ইহা জানা যায়—

মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী।
জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আর্ত্তি॥

—নরোত্তমবিলাস[১]

নরহরি সুন্দররূপে ভোগ রাঁধিতে পারিতেন। প্রবাদ এই যে, নরহরি একদিন মনে মনে ভোগ রাঁধিয়া গোবিন্দজীকে উৎসর্গ করেন। গোবিন্দজী তাহাতে প্রীত হন এবং তাঁহার হস্তের ভোগ পাইবার জন্য জয়পুরের মহারাজকে স্বপ্নাদেশ দেন। স্বপ্নাদেশ পাইয়া জয়পুরের মহারাজ নরহরির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁহার দ্বারা গোবিন্দের ভোগ প্রস্তুত করাইয়া তাহা উৎসর্গের পর বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান। তদবধি তাঁহার নাম হয় "রসুইয়া পূজারী"।

নরহরি একাধারে সুনিপুণ গায়ক, বাদক, সুপাচক এবং ঐতিহাসিক ছিলেন।[২] চৈতন্যোত্তর যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য এবং

১ বহরমপুর (গ্রন্থকর্তার পরিচয় প্রসঙ্গে), ২য় সং, পৃঃ ১৯৮

২ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৯

তৎকালীন ভক্তবৃন্দের অপ্রকাশিত জীবন-বৃত্তান্ত অতি ভক্তিসহকারে সংগ্রহ করিয়া ইনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংস্কৃতেও ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। কবিরাজ গোস্বামীর পর বৈষ্ণবসমাজে আর কেহ নরহরির ন্যায় প্রগাঢ় সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য-দ্যোতক সুবৃহৎ চরিত-গ্রন্থ রচনা করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

গ্রন্থাবলী

(১) ভক্তিরত্নাকর—এই গ্রন্থে পঞ্চদশ তরঙ্গ (অধ্যায়) আছে।

বিষয়বস্তু—

প্রথম তরঙ্গ—রূপ-সনাতনের পূর্ব-পুরুষগণের বিবরণ, গোস্বামি-গ্রন্থাবলীর তালিকা, শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম-সূত্র প্রভৃতি।

দ্বিতীয় তরঙ্গ—শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাব, রূপ-সনাতনের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার, রূপ গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা, সনাতন গোস্বামীর শ্রীমদনমোহন সেবা, মধু পণ্ডিতের শ্রীগোপীনাথের সেবা-প্রকট বিষয়ের বর্ণনা প্রভৃতি।

তৃতীয় তরঙ্গ—নরহরি সরকার ঠাকুরের আদেশে শ্রীনিবাসের নীলাচল-গমন, পথে মহাপ্রভুর অপ্রকটবার্তা শ্রবণ, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন, নীলাচল হইতে শ্রীনিবাসের গৌড়ে প্রত্যাগমন প্রভৃতি।

চতুর্থ তরঙ্গ—শ্রীনিবাসের গৌড়মণ্ডলে কতিপয় স্থান দর্শনের পর ব্রজে গিয়া গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি।

পঞ্চম তরঙ্গ—শ্রীনিবাস-নরোত্তমের মাথুর-মণ্ডল দর্শন, মহাপ্রভু কর্তৃক শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার প্রভৃতি।

ষষ্ঠ তরঙ্গ—শ্যামানন্দের জীবনী, গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দের গৌড়দেশে যাত্রা প্রভৃতি।

সপ্তম তরঙ্গ—বৃন্দাবন হইতে আনীত-গ্রন্থ পথে বিষ্ণুপুরে অপহরণ, গ্রন্থ উদ্ধার প্রভৃতি।

অষ্টম তরঙ্গ—নরোত্তমের গৌড় ও উৎকলে ভ্রমণ, শ্রীনিবাসের গার্হস্থ্য-জীবন প্রভৃতি।

নবম তরঙ্গ—শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে গমন, প্রত্যাবর্তন, বন-বিষ্ণুপুরে অবস্থান প্রভৃতি।

দশম তরঙ্গ—হরিদাস আচার্যের তিরোভাব, খেতরির কাহিনী প্রভৃতি।

একাদশ তরঙ্গ—জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবনে গমন, নিত্যানন্দ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি।

দ্বাদশ তরঙ্গ—ঈশানের সহিত শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ ভ্রমণ, নবদ্বীপের বিবরণ প্রভৃতি।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ—বীর হাম্বীরের যাজিগ্রামে আগমন, জাহ্নবাদেবী-কর্তৃক বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা-বিগ্রহ প্রেরণ ইত্যাদি।

চতুর্দশ তরঙ্গ—ব্রজ ও গৌড়দেশে পত্র-বিনিময়, বোরাকুলি গ্রামে মহোৎসব প্রভৃতি।

পঞ্চদশ তরঙ্গ—শ্যামানন্দ কর্তৃক উৎকলে ধর্ম প্রচার, গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইত্যাদি।

(২) **নরোত্তমবিলাস**—এই গ্রন্থে নরোত্তম-চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহা আকারে অনেক ছোট।

(৩) **গৌরচরিত চিন্তামণি**—এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর চরিত-বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে তৎকালীন নবদ্বীপবাসিগণের আচার-ব্যবহারের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ ভক্তিরত্নাকরের পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে বলিয়া নিখিলনাথ রায় মনে করেন।[১]

(৪) **গীতচন্দ্রোদয়**—নরহরি 'গীত-চন্দ্রোদয়' নামে এক সুবৃহৎ পদগ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থের আটটি বিভাগ। যথা:—গৌরকৃষ্ণরসামৃত, গৌরকৃষ্ণভাবনামৃত, গৌরকৃষ্ণচরিতামৃত, গৌরকৃষ্ণ-বিলাসামৃত, গৌরকৃষ্ণলীলামৃত, নিত্যসেবামৃত, নামামৃত ও প্রার্থনা-মৃত।[২] ইহার মধ্যে প্রথম বিভাগ গৌরকৃষ্ণরসামৃতের অন্তর্গত

---

১ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১২দশ অধ্যায় (বঙ্গাব্দ-১৩০৯) পৃঃ ৬৩১

২ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য (১ম সং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২

'পূর্বরাগ প্রকরণ' মাত্র হরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ১১৭০টি 'পদ' আছে।

(৫) শ্রীনিবাস চরিত্র—ইহাতে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। ভক্তিরত্নাকরে এই গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়।[১]

এইসব গ্রন্থ ব্যতীত "পদ্ধতি-প্রদীপ" নামে একখানি গ্রন্থও নরহরির নামে চলিয়া আসিতেছে।

হরিদাস দাস "ছন্দঃসমুদ্র" নামে একখানি গ্রন্থও নরহরির রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

রাধামোহন

শ্রীনিবাস আচার্যের বংশে রাধামোহনের জন্ম। পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে রাধামোহন বলিয়াছেন, যে তাঁহার পিতা জগদানন্দ, পিতামহ কৃষ্ণপ্রসাদ, প্রপিতামহ গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দ ও বৃদ্ধ-প্রপিতামহ শ্রীনিবাস আচার্য।[৩]

রাধামোহন ছিলেন ভক্তিমান্, কবি, পণ্ডিত ও সংগীত বিশারদ। শ্রীনিবাসের পর তাঁহার বংশে এরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আর কেহ আবির্ভূত হন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। রাধামোহনের শিষ্য বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন) অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে "পদকল্পতরু" সংকলন করেন। ইনি গ্রন্থ-শেষে রাধামোহনকে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অত্যুক্তি নয়—

শ্রীআচার্য্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন।
কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥

১ ভক্তিরত্নাকর—১৪শ তরঙ্গ, গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ১৯৩, পৃঃ ৬৩৯

২ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য, ১ম খণ্ড (১ম সং), পৃঃ ২১৩

৩ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ-ভূমিকা পৃঃ

যাঁহার বিগ্রহে গৌর-প্রেমের নিবাস।
যেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥

শ্রীনিবাস আচার্যের অপ্রকটের সময় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দই শুধু বর্তমান ছিলেন।[১] গতিগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ এবং কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের দুই বিবাহ। রাধামোহন জগদানন্দের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজ প্রথম সন্তান।[২]

মুর্শিদাবাদ জিলার মালিহাটিতে ১১০৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাধামোহন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৮৫ বঙ্গাব্দে (১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) অর্থাৎ তাঁহার শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইবার তিন বছর পরে দেহত্যাগ করেন। রাধামোহন অপুত্রক ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর সাতদিন পরে তাঁহার স্ত্রীও মারা যান।[৩]

রাধামোহন স্বীয় পিতৃদেব জগদানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া পদামৃতসমুদ্রে তাঁহার বন্দনা-শ্লোক হইতে জানা যায় —"বন্দেতং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কম্।"

রাধামোহন অধ্যাপনাও করিতেন। বৈদ্যপুর-নিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার এবং টেয়াঁ নিবাসী কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্র। রাধামোহনের দুইজন প্রিয় শিষ্যের নাম—কালিন্দী দাস ও পরাণ দাস।

একটি ঘটনায় রাধামোহনের খ্যাতি সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। একবার বৃন্দাবন এবং তাহার নিকটস্থ স্থানের বৈষ্ণবগণের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। জয়পুর-রাজের সভায় বিচারে স্বকীয়াবাদের মতই গৃহীত হয়। অপর পক্ষ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এ সম্বন্ধে গৌড়দেশস্থ বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণের

১ অনুরাগবল্লী, ৬ষ্ঠ মঞ্জরী, মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত (৩য় সং), পৃঃ ৪৩
২ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবে অভিধান, পৃঃ ১৩৯২
৩ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ১১৬

মতামত গ্রহণ দরকার বলিয়া মনে করেন। তখন জয়পুর-রাজ তাঁহার সভাসদ এবং স্বকীয়া মত সংস্থাপক কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যকে বাঙলায় পাঠাইয়া দেন। বাঙলার বৈষ্ণবগণ বিনাবিচারে স্বকীয়া মত গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায় নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর দরবারে বিচার হয়। ইহাতে কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য রাধামোহনের সহিত বিচারে পরাজিত হন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই বিচার-সংক্রান্ত তুইখানি দলিল সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

১ বঙ্গাব্দ—১৩০৬, ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩০৮, ১ম সংখ্যা

(প্রথম দলিল)

৺শ্রীশ্রীহরি
শরণং

মহুর	সহি	মহর
কাজাই	কাননগো	নবাব জাফর খাঁ

মহুর	মহুর
ফৌজদারি	সাহিনা
	নিগার

নকল বিমজ্জীম	মহর
আশ	আবস্কা
	নিগার

শ্রীরাধানন্দ সেবক		শ্রীমদনমোহন সেবক	
সাঃ জগতা	১	সাঃ রূপপুর	১
শ্রীরাধাবিনন্দ সেবক		শ্রীব্রজানন্দ সেবক	
সাঃ শ্রীপাট খড়দহ	১	সাঃ কানাই ডাঙ্গা	১
শ্রীশ্যামানন্দ সেবক		শ্রীশ্রী৺অদ্বৈত সন্তান	
সাঃ গঙ্গানাপুর মাকদহ	১	শ্রীগোপাল গোবিন্দ	
শ্রীআত্মারাম সেবক		সেবক,দ্বয়ং	
সাকীন মুপুর	১	সাঃ শান্তিপুর	১
শ্রীবল্লভিকান্ত সেবক		শ্রীকৃষ্ণকীঙ্কর সেবক,দ্বয়ং	
সাঃ বিরচন্দ্রপুর	১	সাঃ রায়না	১
		শ্রীপ্রস্থানন সেবকদ্বয়ং	
		সাঃ বাহাদুরপুর	১

৫ গোবিন্দ জিউ
২ বৃন্দাবন
৪ গোস্বামী

৯ চৈতন্য

৫ জিব গোস্বামী

লিখিতং শ্রীরাসানন্দ দেবস্য তথা শ্রীরাঘবিন্দ দেবস্য তথা শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্য তথা শ্রীআত্যারাম দেবস্য শ্রীবল্লবিকান্ত দেবস্য তথা শ্রীমদনমোহন দেবস্য শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবস্য ও গয়রহ ইস্তফা পত্র-মিদং কার্য্যনঞ্চ আগে সন ১১২৫ সাল আমরা শ্রীশ্রী৺ গিয়া সওয়াই জয়শীংহ মহারাজা মহাসয় শ্রীশ্রী৺ তিন লক্ষ বর্ত্তিষ হাজার ভাগবত সাস্ত্র গ্রন্থ করিয়াছিলেন তাহার ১ লক্ষ গ্রন্থ শ্রী৺জমুনায় সমর্পন করিআছিলেন বাকী এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রীশ্রী৺ পদ্মাসনে গচগীরি গারা ছিল বাকী এক লক্ষ বত্তিষ হাজার গ্রন্থ শ্রী৺ গাদিতে আছিল তাহার গাদিয়ান এক মৎ শ্রী৺ আছলা তাহার পর মেলেচ্ছের কালে গাদী মেলেচ্ছে শ্রীমর্ন্দারে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছের ভয়ে শ্রীশ্রী৺ জয়নগরে গেলেন পদ্মাসন খুদিয়া সেই একলক্ষ গ্রন্থ আনায়া শ্রীমহারাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনায়া এবং পঞ্চ দেবালয়ের গোস্বামী আনীয়া সেই সকল গ্রেন্থ বিচার করিয়া সকিয়া ধর্ম্মপ্রেধান করিয়াছিলা সকলে কহিলেন সকিয়া ধর্ম্ম স্থাহি শ্রীশ্রী৺ স্থানে সকীয়া প্রেকাষ করিবেন এবং আমাদিগে কহিলেন তোমরাহ সকীয়া ধর্ম্ম জাজন করহ এবং নতুবা বিচার করহ তাহাতে দেব প্রণিত বিচারে সকীয়া স্থাহি করিলেন আমরা পরকিয়ামৎ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া সকীয়ায় দস্তখত করিয়াছিলাম পরে আমরা কহিলাম গৌরদেশে শ্রীশ্রী৺ প্রভুর পাদাঙ্কীত স্থান সেখানে শ্রীশ্রী৺ভাগবত সাস্তি আছেন এবং সভাসত স্থান আছেন তাহারা মহাপাধ্যায় বিচার হইবেক গোড়ে পরকিয়া ধর্ম্মের অধিকারী তাহারা সকীয়া ধর্ম্ম লবে কেন এখানে জেমৎ সভাসদ হইল গৌরদেশে অনেক সভাসত আছে বিচার করিবেক অতএব এখানকার সভাসদ এক পণ্ডিত ও এক মন-স্বোপদার জায় তবে বিচার করিয়া সকীয়া ধর্ম্ম সঙ্গস্থাপন করিয়া আইসে তাহাতে সর্ব্বসনমৎ মতে শ্রীযুক্ত মহারাজা সভাসদ শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য জিহোঁ সকীয়া পরকীয়া বিভিন্ন্য করিলেন তিহোঁ দিগবিজয় মহারাজার সভা হইতে তাহাকে আনীয়া এবং এক মন-স্বোবদার সহিত প্রেয়াগ ও কাশী হইয়া আইলাম তারাও সকীআত

দস্তখত করিয়া দিলেন পরে গৌড়দেশে আসীয়া গোস্বামীগণ এবং মহাস্তসন্তান মহাস্তসাখাগণ জে জে স্থানে আছেন সর্ব্বত্রে অনেক বিচার হইল সকলে বিচারে দিগবিজই স্থানে অজয় পত্র দিলেন পরে শ্রীপাট খণ্ডে আইলাম তাহাদের সহিত অনেক কথপকথন হইল তাহারা কহিলেন আমরা শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু মতাবলম্বি তাহার মতাঅধিকারী শ্রীশ্রী৺ ছয় গোস্বামী তাহারা জে মত অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন 'সেই মত আমরা জাজন করি সেই স্বব মতের সার গোস্বামীরা বেদ প্রিণিত এবং ওন প্রিণিত এবং রস প্রিণিত জে সকল ভাগবত সাস্ত করিয়া আছেন তাহা বিতিরেক করিয়া আমরা সকীআয় কিমত দস্তখত করিব অতএব শ্রীযুত গোস্বামীর গাদির গ্রন্থসাস্তে অধিকারী শ্রীশ্রী৺চিনিবাষ আচার্য্য ঠাকুর তাগার সন্তানসকল আছেন তাহাদের স্থানে আগে দস্তখত করাহ তবে আমরাহ দস্তখত করিআ দিব এ কথায় আমরা শ্রীপাট জাজিগ্রাম জাইয়া দখল করিতে কহিলেন আমরা সকীআঅ দস্তখত বিনা বিচারে পারিব না আমরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মতবলম্বি অতএব বিচারে জে ধর্ম্ম স্থাই হয়ে তাহাই লইবে এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিহোঁ কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্মে বিনা তজবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন সেই মত সভাসদ হইল শ্রীপাট নবদ্বিপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গদেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার শোনারগ্রামের শ্রীশ্রীরাম রাম বিদ্যভূসন ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রী-কাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারি ও শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য ও গয়রহ একর্ত্ত হইয়া শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শ্রীশ্রী৺আচার্য্য ঠাকুরের সন্তান তাহার সঙ্গে শ্রীযুত রাজা সওাযের সভাপণ্ডীত অনেক সাস্ত সিদ্ধান্ত বিচার করিলেন তাহাতে শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য প্রভুর সন্তান শ্রী৺ রাধামোহন ঠাকুরকে পরাভব করিতে পারিলেক না অতএব শ্রীদ্বিগবিজয় ভট্টাচার্য্য পরাভব হইয়া অজয় পত্র লিখিয়া ঠাকুরের স্থানে শীস্য হইয়া পরকীয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেক এবং দস্তখত পরকিয়ায়

ধর্ম্মের পর করিয়া দেসকে গেলেন এখানে জে সকল সাস্ত গ্রেন্থ লইয়া বিচার হইল সেই সাস্ত শ্রীদ্বীগবিজয় শ্রীযুত মহারাজার নিকট গেলেন পুন ২সভা শ্রীযুত রাজার সভাসতে বিচার হইল বিচারে পরক্রিয়া ধর্ম্ম মোক্ষ হইল শ্রীমৎ আগম শ্রীমৎ ব্রহ্মবৈবত্ত এবং শ্রীমৎ ব্রেসদেবের শ্রীমৎ ভাগবৎ এবং শ্রীমৎ হরিবংস আদি ভাগবত সাস্ত এবং শ্রী৺গোস্বামীদিগের শ্রীমৎ ভক্তিসাস্ত এই সকল গ্রেন্থের মতে পরাভব হইয়া জয়নগরে গেলেন সেখানে পুন সভাসত হইয়া বিচার হইল শ্রীশ্রী৺ রাধাকুণ্ডে পরক্রিয়া ধর্ম্মের ঢাণ্ডা গারা গেল এখানে পরকীয়া অধিকারী চারি অধিকারী শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সন্তান শ্রীরাধামোহন ঠাকুর অতএব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের পরিবার ও আচার্য্য ঠাকুরের পরিবার শ্রীমৎ নরত্তম ঠাকুরের পরিবার ও শ্রীমৎ জীব গোস্বামীর পরিবার এই চার গুবে বাঙ্গলায় আমরা পঞ্চপরিবারের মধ্যে খারিজ হইলাম তোমরা আপন ২ পরিবারে বিলাতে দখল করিয়া পরম যুখে ভোগ করহ আমরা এই চারি পরিবারে দখল করিব না দখল করি শ্রীশ্রী৺ সরকারে দণ্ডী এবং গুনাকার হইব এতদর্থে বিচার পরাভব হইয়া ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তারিখ ১৭ ফাল্গুন—

ইসাদি

শ্রীদক্ষনারায়ণ মজুমদার	শ্রীআসান খাঁ।	শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য
সাকীম ডাহাপাড়া	মনসোপ ফোজদারি	সাঃ শ্রীপাট নবদ্বীপ
শ্রীকাজী ছদরদ্দী	শ্রীরামহরি মজুমদার	শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার
সাঃ মহিমাপুর	মনস্বোপ অবস্থানিগর	সাঃ উৎকল কটক
	শ্রীসেখ হিঙ্গান	শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য
	মনস্বোপ ঘউরী	সাঃ মহুলা

শ্রীশ্রীরাম রাম বিদ্যাভূষণ
সোনার গ্রাম
শ্রীহয়ানন্দ ব্রহ্মচারি
সাঃ শ্রীকাশী

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, ৪র্থ সংখ্যা)

(দ্বিতীয় দলিল)

শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ শ্রীশ্রী:গাবিন্দ জীউ শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ

শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভু

সধর্ম্মান্বিত শ্রীস শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বরা:বরেষু

শ্রীরাশানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীধরণীধর দেবশর্ম্মণ
শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীবল্লবীকান্ত দেবশর্ম্মণ

শ্রীজগদানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণ
শ্রীসাহেব পঞ্চানন্দ দেবশর্ম্মণ
প্রভুসন্তান বর্গেষু

লিখিতং শ্রীজগদানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং সুপুর তস্যপর শ্রীরাসানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং লোতা তস্যপর শ্রীমদনমোহন দেশশর্ম্মণ সাং সুদপুর তস্যপর শ্রীমুরলীধর দেবশর্ম্মণ সাং শ্রীপাট খড়দহ তস্যপর শ্রীবল্লবিকান্ত দেবশর্ম্মণ সাং বিরচন্দ্রপুর তস্যপর শ্রীসাহেব পঞ্চানন দেবশর্ম্মণ সাং গএষপুর তস্যপর শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং কানাই-ডাঙ্গা প্রভূ সন্তবর্গেষু।

ইস্তফাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺ স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতে গৌড় মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেয়ায় জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগবিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতসাহি মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আশীয়া-ছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকীয়া সধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগবিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবদ্দিপের সভাপণ্ডীত এবং কাশীর সভাপণ্ডীত

এবং সোনারগ্রাম বিক্রমপুরের সভাপণ্ডীত এবং উৎকলের সভাপণ্ডীত এবং ধর্ম্মঅধিকারী ও বৈরাগী ও বৈষ্ণব সোল আনা একত্র হইয়া শ্রীমৎ ভাগবত সাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম গোশ্বামীদিগের ভক্তিসাস্ত্র লইয়া শ্রীধর স্বামীর টিকা ও তোসণী লইয়া শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মজকুরের সহিত এবং আমরা থাকিয়া ছয়মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাভূত হইয়া স্বকিয় ধর্ম্ম স্বংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই পরকীয়া স্বংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন আমরাও দিলাম সে পত্র পুনরায় পাঠাইলাম শ্রীবৃন্দাবনে জয়নগরে তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন পরকীয় ধর্ম্ম সে দেষে ও সেখানে সভাপণ্ডীত লইয়া ও দেবালয় আদি একত্র হইয়া তোমার সিদ্ধান্তপূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন অতএব গৌড়মণ্ডলে পরকীয় ধর্ম্ম স্বংস্থাপন হইল পরকীয় ধর্ম্ম অধিকারি তোমাকে করিয়া পাঠাইলেন এবং শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন হইতে সিরোপা তোমাকে আইল আমরা পরাভূত হইয়া বাঙ্গালা উড়স্যা ও সোবে বেহার এই পঞ্চ পরিবারে বেদাও শ্রীমদ জীবগোশ্বামী ও শ্রীযুত নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীযুত ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুত আচার্য্য ঠাকুর ও শ্রীযুত শ্যামানন্দ গোস্বামী এই পঞ্চ পরিবারের উপর বিলাত সম্বন্ধে ইস্তফা দিলাম পুনরায় কাল কাল ও বিলাত সম্বন্ধে অধীকার করি তবে শ্রীশ্রী৺তে বহিভূত এবং শ্রীশ্রী৺সরকারে গুণাগার এতদর্থে তোমারদিগের পরিবারের উপর বেদাত্তা ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ—

শ্রীকৃষ্ণদেব দেবশর্ম্মণ—

সাং জয়নগর

এই পত্রে শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য অজয়পত্রমিদং আমীহ স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেওায় জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে স্বকীয় ধর্ম্মের পরওানা লইয়া গৌড়মণ্ডলে

স্বকীয় সংস্থাপন করিতে আশীয়াছিলাম শ্রীযুত পাতসাহার হুকুম মত ত্রৈলাঙ্গী লোক সঙ্গে করিয়া গৌড়মণ্ডলে সর্ব্ব সুদ্ধা স্বকীয় সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আশীয়াছিলাম মালিহাটী মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্ম্মবিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺গোস্বামীদিগের ভক্তিসাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্তমতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয় পত্র লিখিয়া দিলাম এবং সিস্য হইলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ

ইসাদী

শ্রী৺অদ্বৈত গোস্বামী	মহান্ত সন্তান	
সন্তান	শ্রীবক্রেশ্বর দেবশর্ম্মণ	
শ্রীকালীচন্দ দেবশর্ম্মণ	সাং বসতপুর	
সাং শ্রীপাট সান্তিপুর	শ্রীআত্মারাম ঠাকুর	
শ্রীকৃষ্ণকীশোর দেবশর্ম্মণ	সাং কুলীনগ্রাম	
সাং বাবলা	শ্রীলালাজীউ দেবশর্ম্মণ	
শ্রীকৃষ্ণরাম দেবশর্ম্মণ	সাং মালপাড়া	
সাং নবদ্বীপ	শ্রীদর্পনারায়ণ রায়	সাং জয়নগর
শ্রীসাহেব পঞ্চানন শর্ম্মণ	কানুনগো	শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মণ
সাং বাহাদুরপুর	সাং কাশীমহাট পুখরিয়া	ইতি
শ্রীনারায়ণ দেবশর্ম্মণ	শ্রীসম্ভুনাথ মিত্র	শ্রীপ্রাণনাথ রায়
সাং নাসিগ্রাম	সাং চুনাখালী	সাং দিনাজপুর সাহবাশী
শ্রীব্রহ্মানন্দ দেবশর্ম্মণ	শ্রীদামোদর ঘোষ	বিদ্যাবাগীষ
সাং শোনারগ্রাম বিক্রমপুর	সাং কুরুডপাড়া	শ্রীশ্রীধর দেবশর্ম্মণ
শ্রীব্রজভূষণ দুবে	শ্রীসেখ কাজী সদরদ্দীন	সাং উৎকল জাজপুর
সাং বিষ্ণুপুর রাম ডিহা	সাং কুড়ারিয়া	শ্রীনয়নানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীরাধাবল্লভ দাস	শ্রীসৈয়দ করম উল্লা	সাং বানারস
সাং বিষ্ণুপুর	সাং চোষরিয়া	শ্রীকাশীশ্বর দেবশর্ম্মণ

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮, ১ম সংখ্যা)

ইহা ছাড়া হরিদাস দাস স্বকীয়া-পরকীয়ার মীমাংসা সম্বন্ধে আরও একটি "অজয় পত্র"[১] প্রকাশ করিয়াছেন—

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-গোবিন্দ গোপীনাথ জীউ

অজয় পত্র

শ্রীলশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-স্বধর্মান্বিত শ্রীলরাধামোহন শর্মা বরাবরেষু—

অত্র পত্রে লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদেব শর্মণা ভট্টাচার্যেণ অজয়-পত্র মিদং লিখনং কার্য্যনঞ্চ শ্রীযুত পাৎসাহার হুকুম ফরমান ও তয়নাতী মনবদার লইয়া গৌড়মণ্ডলে আসিয়া সর্বত্র গোসাঞি মোহান্ত অধিকারী বৈষ্ণব পণ্ডিত সকলকে বিচারে পরাভূত করিয়া স্বকীয়া ধর্ম সংস্থাপন করিয়া মোকাম মুর্শিদাবাদ শ্রীযুত নবাব সাহেবকে ফরমান দেখাইয়া তোমাকে তলব করাইয়া আনাইলাম। পরে তোমার আখেজ মতে শ্রীযুত নবাব সাহেব মধ্যস্থ ছিলেন। মধ্যস্থ মোকাবিলাতে শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীধরস্বামির টীকা ও সন্দর্ভ, তোষণী প্রভৃতি বৈষ্ণব-শাস্ত্র লইয়া তোমার সহিত স্বকীয়া-পরকীয়া বিচার ছয়মাস পর্য্যন্ত করিয়া বিচারে স্বকীয়া ধর্ম-সংস্থাপন করিতে পারিলাম না। তোমার সিদ্ধান্ত মতে পরকীয়া ধর্ম সংস্থাপন যইল। অতএব এই অজয়পত্র লিখিয়া দিয়া তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম। ইতি সন ১১২৭ সাল, মীমাংসা সন ১১২৮ সালের বৈশাখ।

হরিদাস দাসের এই অজয়-পত্রে ইশাদীগণের নাম নাই এবং তিনি ইহা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধেও কিছু বলেন নাই। কাজেই এই অজেয়-পত্র যে মূল অজয়-পত্রের প্রতিলিপি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংগৃহীত যে দুইখানি দলিলের প্রতিলিপি দেওয়া হইল, তাহার প্রথম দলিলখানি সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশের সময় রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—"আমার বন্ধু টেঁয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল গুপ্তের নিকট প্রথমে এই দলীলের কথা শুনিতে পাই। মূল দলীলখানি

১ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, ১ম খণ্ড; পরিশিষ্ট (খ) পৃঃ ২৫১

রাধামোহন ঠাকুরের বংশধরগণের নিকট মালিহাটি গ্রামেই বর্ত্তমান ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বেও দলীলখানি সেই স্থানে ছিল শুনিয়াছি; আমি ঠাকুর মশায়গণের বাটী অনুসন্ধান করিয়া এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হই নাই। মালিহাটির নিকটবর্ত্তী টেঁয়াগ্রাম নিবাসী…নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট মূল দলীলের প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই প্রতিলিপি আনাইয়াছিলাম। সেই প্রতিলিপি মূল দলীল হইতেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ শুনিয়াছি। এ স্থলে সেই প্রতিলিপিরই অবিকল নকল প্রকাশিত হইল। এই প্রতিলিপি বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ; সম্ভবতঃ লিপিকারেরই অজ্ঞতা হইতে এই বর্ণাশুদ্ধির উৎপত্তি। ঐ সকল বর্ণাশুদ্ধি সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।…যে প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল, উহার যথার্থ্যে সন্দেহ কয়িবার কোন কারণ দেখিতেছি না।" সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দ্বিতীয় দলিলখানি প্রকাশের সময় রামেন্দ্রসুন্দর মন্তব্য করেন যে, এখানি তিনি জেমো (কান্দি) বিশ্বাসপাড়া-নিবাসী শ্যামসুন্দর ঘোষের নিকট পাইয়া তাহা অবিকৃতভাবে প্রকাশ করিলেন।

এখন এই দলিল দুইখানির মধ্যে কোন্‌খানি গ্রহণযোগ্য তাহার বিচার করিতে হইবে। প্রথম দলিল এবং দ্বিতীয় দলিল সম্পাদনের তারিখের মধ্যে মিল নাই। বিশেষতঃ দুই দলিলে স্বাক্ষরকারী ও সাক্ষীর নামের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন যে, এই দুইখানি দলিলই মূল-পত্রের নকল। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের জন্য দ্বিতীয়খানিতে আমাদের সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় দলিলে সাক্ষীর নামের মধ্যে আমরা কানুনগো দর্পনারায়ণের নাম দেখিতে পাই এবং এই দলিল বাঙ্গালা ১১৩৮ সালে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। বাঙ্গালা ১১৩৮ সাল = ইংরাজী ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু তাহার পূর্বে দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। নিখিলনাথ রায় লিখিয়াছেন যে, "১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদসাহ মহম্মদ সাহের দত্ত তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণের

ফার্ম্মাণে দর্পনারায়ণের মৃত্যুর উল্লেখ আছে।"[১] কাজেই বাঙ্গলা ১১৩৮ সাল বা ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দর্পনারায়ণ জীবিত থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দিন খাঁর রাজত্বসময়, যখন বিচার হয় তখন বাঙলার শাসন-কর্তা ছিলেন নবাব জাফর খাঁ (মুর্শিদকুলি খাঁ)।[২] মুর্শিদকুলি খাঁ পরলোকগত হন ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে।[৩] কাজেই দ্বিতীয় দলিলখানি আমাদের নিকট প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম দলিল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যদিও তিনি মূল-দলিলখানি রাধামোহন ঠাকুরের বংশধরগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়া পান নাই; কিন্তু যেখানি তিনি টেঁয়াগ্রাম-নিবাসী নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা মূল দলিলেরই প্রতিলিপি। আমরা তাহা বিশ্বাস করি। কেননা টেঁয়াগ্রাম মালিহাটি গ্রামেরই নিকটবর্ত্তী। কাজেই নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা রাধামোহন ঠাকুরের বংশধরগণের নিকট রক্ষিত মূল দলিলেরই প্রতিলিপি হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কাজেই প্রথম দলিলখানিই আমরা সবদিক হইতে বিচার করিয়া মূল দলিলের নকল বলিয়া মনে করি।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী[৪] এই দলিল দুইখানি এক কথায় জাল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য হইল—"উভয় দলিলের বিষয় এক। এই ধরনের একই ঘটনা দুইবার বিভিন্ন বৎসরে বা বিভিন্ন সময়ে ঘটিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যে নামগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাও অকৃত্রিম মনে

১ নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১২শ অধ্যায় (বঙ্গাব্দ ১৩০৯) পৃঃ ৬৩৬

২ ঐ এবং পূর্ণচন্দ্র মজুমদার—The Musnud of Murshidabad, পৃঃ ২১—২২

৩ নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১২শ অধ্যায় (বঙ্গাব্দ ১৩০৯) পৃঃ ৬৩৬

৪ বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য (১৯৬৮), পৃঃ ৩৯

হয় না। যথা প্রথম দলিলে তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার। এইরূপ নাম দক্ষিণ ভারতীয় কোন ব্যক্তির বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয়তঃ এই সকল পণ্ডিত সংস্কৃত শাস্ত্র লইয়া বিচার করিয়াছেন। সংস্কৃতেই সেকালে জয়পত্র লিখিয়া দেওয়ার রীতি ছিল। বিশেষ করিয়া যেখানে জয়পুর ও তৈলঙ্গদেশের পণ্ডিত রহিয়াছেন সেখানে ফার্সী মিশ্রিত বাংলায় দলিল লেখা হইয়াছে ইহা একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। চতুর্থতঃ উভয় দলিলের নামগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, নামগুলির মধ্যেও পার্থক্য আছে। উপরন্তু দলিলে বর্ণাশুদ্ধির প্রাচুর্য দেখিলেও ইহা কোন পণ্ডিতজন লিখিতে পারেন বলিয়া মনে করা অসম্ভব।"

ডক্টর বাসন্তী চৌধুরীর এই মন্তব্যের মধ্যে সত্যাসত্য কি নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। বিচার যে দুইবার হইয়া দুইখানি দলিল সম্পাদিত হয় নাই, তাহা আমরাও স্বীকার করি। দুইখানি দলিলের মধ্যে প্রথম দলিল[১]খানিই—যে সব কারণে মূল-দলিলের প্রতিলিপি হওয়া স্বাভাবিক, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তাই বলিয়া দ্বিতীয় দলিল[২]খানিও জাল নহে। সম্ভবতঃ পরবর্তী-কালে কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত একখানি দলিলের নকল হইতে পুনরায় তাহা নকল করিবার সময় ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকিবে এবং ইহাই স্বাভাবিক। এইজন্য দুই দলিলের নামগুলির মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ প্রথম দলিলের ইশাদী তৈলঙ্গদেশের রামজয় বিদ্যা-লঙ্কারকে দক্ষিণ ভারতীয় কোন ব্যক্তি বলিয়া অবধারণ করা সমীচীন হয় নাই। "এক সময়ে কশাই (কপিশা) ও বৈতরণী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ (অর্থাৎ আধুনিক বালেশ্বর জিলা ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ) উৎকল নামে খ্যাত ছিল এবং বৈতরণী হইতে গোদাবরী (পরে কৃষ্ণা হইতে মহানদী) পর্যন্ত বিস্তৃত দেশকে কলিঙ্গ বলা হইত।

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬ ৪র্থ সংখ্যা।
২ ঐ , ১৩০৮ ১ম সংখ্যা।

…কলিঙ্গদেশের রাজধানী ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী তোসলি নগরী।

…মেদিনীপুর হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত দেশের নাম ছিল তোসলি।"[১]

কাজেই মেদিনীপুরের কিয়দংশ, উড়িষ্যা এবং তৈলঙ্গদেশ বলিতে আগে একটি জনপদই বুঝাইত। কালক্রমে কলিঙ্গ দুইটি স্বতন্ত্র জনপদ উড়িষ্যা ও অন্ধ্রে পরিণত হইলেও একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, "উড়িষ্যা এবং অন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্রতীরস্থিত অঞ্চলের অধিবাসীরাই কলিঙ্গ জাতির বংশধর।"

সুতরাং রামজয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন কলিঙ্গ তথা উড়িষ্যারই অধিবাসী। এই জন্যই তাঁহার নাম বর্তমান দক্ষিণ-ভারতের মাদ্রাজ বা অন্ধ্রপ্রদেশের লোকের নামের মতো হয় নাই। তৈলঙ্গদেশ বলিতে তখন যে উডিষ্যাই বুঝাইত এবং রামজয় বিদ্যালঙ্কার যে এই উড়িষ্যারই অধিবাসী ছিলেন, তাহা ইশাদীগণের মধ্যে নাম স্বাক্ষর করিয়া তিনি যে ঠিকানা দিয়াছেন, তাহা হইতেও স্পষ্ট বোঝা যায় :—"সাং উৎকল কটক।"

তৃতীয়তঃ বিচার হইয়াছে নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর দরবারে। বিচারে যাহা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে নবাব সরকার-কর্তৃক দলিল-দস্তাবেজ লিখিবার জন্য নিয়োজিত কর্মচারী-দ্বারাই লেখা হইয়াছে। কাজেই ফার্সী-মিশ্রিত বাঙলায় যে ভাবে দলিল লিখিবার রীতি সেই ভাবেই লেখা হইয়াছে। তাহা না হইয়া যদি পণ্ডিতগণ-কর্তৃক সংস্কৃতে দলিল রচিত হইত, তাহা হইলেই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত এবং সে ক্ষেত্রে সন্দেহের কারণ দেখা দিত।

চতুর্থতঃ দুই দলিলের নামগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া ডক্টর চৌধুরী যে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উত্তর পূর্বেই দেওয়া

১ ভারতকোষ, ২ খণ্ড ("ওড়িষ্যা", "উড়িশা"-শব্দ—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার) পৃঃ ৯১

হইয়াছে। দলিলে বর্ণাশুদ্ধির প্রাচুর্য দেখিয়া তিনি ইহা কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয় নাই বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন নহে। দলিল কোন সময়েই পণ্ডিত ব্যক্তি বা উচ্চ-শিক্ষিত লোকে রচনা করে না। সাধারণ লেখাপড়া-জানা লোকই সচরাচর দলিল-লেখকের কার্য করিয়া থাকে। কাজেই বর্ণাশুদ্ধি থাকিবেই, তখনকার দিনেও থাকিত, এখনও থাকে।

সুতরাং ডক্টর বাসন্তী চৌধুরীর কোন মতই আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

রাধামোহন এই বিচারে জয়লাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ তথা সমগ্র বঙ্গসমাজকে যে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। তিনি ছিলেন খুব তেজস্বী পুরুষ। কথিত আছে যে, মহারাজ নন্দকুমার একবার রাধামোহনকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে রাধামোহন এক দরিদ্র শিষ্যকে দর্শনদানের জন্য গমন করেন। ইহাতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় নন্দকুমার একটু ক্ষুণ্ণ হন। রাধামোহন তাহা বুঝিতে পারিয়া নন্দকুমারকে বলেন যে, গুরুর নিকট ধনী-দরিদ্র উভয় শিষ্যই সমান। ইহাতে কোন শিষ্য ক্ষুণ্ণ হইলে, সেই শিষ্য যদি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরও হয়, তবু তাহার বাড়ীতে আর যাওয়া চলে না। তদবধি রাধামোহন আর নন্দকুমারের গৃহে গমন করেন নাই।[১] শোনা যায়, শ্রীনিবাস আচার্য সপার্ষদ মহাপ্রভুর এক তৈল-চিত্রের পূজা করিতেন এবং রাধামোহন স্নেহবশতঃ ইহা তাঁহার প্রিয় শিষ্য নন্দকুমারকে দান করেন। অদ্যাপি নন্দকুমারের দৌহিত্রবংশীয় কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে তাহা রক্ষিত আছে। কিন্তু রাধামোহন তাঁহার এই প্রিয় শিষ্য নন্দকুমারকে অগ্রাহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

১ হরিদাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১৭২৮

গ্রন্থ

পদামৃতসমুদ্র—বিভিন্ন বৈষ্ণব-কবির পদাবলী এবং তৎসহ নিজের রচিত অনেকগুলি পদ গ্রথিত করিয়া রাধামোহন এই গ্রন্থ সংকলন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'পদামৃতসমুদ্র' সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন।[১] এই গ্রন্থে ৭৪৬টি পদ আছে। তাহার মধ্যে রাধামোহন ঠাকুরের নিজের রচনা ২৩৮টি পদ। ইহার মধ্যে '২১০টী ব্রজবুলিতে, ২৩টী বাংলায় ও ৫টী সংস্কৃতে রচিত'।

রাধামোহন অনেকগুলি পুঁথির পাঠ মিলাইয়া 'পদামৃতসমুদ্র' সংকলন এবং তাহার 'মহাভাবানুসারিণী' সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। টীকার অনেক জায়গায় তিনি পাঠান্তরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার গ্রন্থ-সম্পাদনার প্রণালীও ছিল বৈজ্ঞানিক। এই গ্রন্থে সংকলিত পদের মধ্যে গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যাই বেশী। কাজেই রাধামোহন গোবিন্দদাসের পদের অনুরাগী ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গোবিন্দদাস ছাড়া চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি আরও অনেক বৈষ্ণব-কবির পদ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। টীকার মধ্যে সংগীতের রাগ-রাগিণীর ধ্যান আছে। ইহাতে সংগীত শাস্ত্রে যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, তাহা বুঝা যায়। ইহা ছাড়া টীকায় তিনি গোবিন্দদাস কর্তৃক ব্যবহৃত অনেক দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ করিয়া দিয়াছেন। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থ বলিয়াছেন যে, এই সব দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ না দিলে গোবিন্দদাসের অনেক পদ আমাদের নিকট দুর্বোধ্য থাকিয়া যাইত।[২] উদাহরণ—

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বন-দাব।
চন্দ মন্দ ভেল   চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাব॥

১ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, ভূমিকা—পৃঃ ৮/০
২ ঐ পৃঃ ১৯

কতয়ে আরাধব মাধব।
তোহে বিনু বাধাময়ি ভেল রাধা॥
কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিঙ্কিণি শঙ্কিনি
কুণ্ডল কুণ্ডলি-ভান।
যাবক পাবক কাজর জাগর
মৃগমদ মদ-করি মান॥
মনমথ মনমথে চঢ়ল মনোরথে
বিষম কুসুম্-শর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিখণে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি॥[১]

এখানে রাধামোহন শোকিল, কন্দন, ঝঙ্কন, শঙ্কিনি, কুণ্ডলি-ভান, মৃগমদ, মদকরি প্রভৃতি দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ করিয়া দিয়াছেন—

"শোকিল শোককারকঃ। বনদাব বনাগ্নিঃ। মন্দ দুঃখদ ইত্যর্থঃ। কন্দন ক্রন্দন ক্রন্দয়তীত্যর্থঃ। মারত ধাব ধাবিত্বা মারয়তীত্যর্থঃ। বাধাময়ী দুঃখময়ী। ঝঙ্কন উদ্বেজকঃ। শঙ্কিনী শঙ্কাদায়িকা। কুণ্ডলী সর্পঃ। পাবক বহ্নিরূপঃ। জাগর হৃদি স্থাং জাগরবতীত্যর্থঃ। মদকরি মান মদযুক্তকরিণং মন্যতে। সাম্যং ভীষণত্বাংশে জ্ঞেয়ম্।"[২]

রাধামোহন এইভাবে দুর্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ করিয়া দিয়া সমস্ত পদটি বুঝিতে আমাদের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন—

মাধব, তোমার বিরহে বৃন্দাবনের কুঞ্জ বন্য হস্তীর ন্যায়, কোকিল শোক-কারক এবং বৃন্দাবন দাবাগ্নিতুল্য হইয়াছে। চন্দ্র এখন মন্দ, চন্দন ক্রন্দন জনক এবং মলয় পবন যেন মারিবার জন্য ধাইয়া আসিতেছে। মাধব! আর তোমাকে কত সাধিব? তোমার বিহনে রাধা আজ দুঃখময়ী। তাহার নিকট কঙ্কণ এখন উদ্বেগজনক, কিঙ্কিণী শঙ্কাদায়িণী, কর্ণ-কুণ্ডল সর্প-কুণ্ডল সম, অলক্ত অগ্নি-তুল্য,

১ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, ৩২৫-৩২৬

২ ঐ, ভূমিকা-পৃঃ ১৵

কাজল জাগরণ-কারক এবং কস্তুরী মদমত্ত হস্তীস্বরূপ। মন্মথ রাধার মন মথন করিয়া তাহার মনরূপ রথে চড়িয়া তাহাকে দারুণ পুষ্পবাণ সন্ধান করিল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—না জানি এতক্ষণে গৌরাঙ্গীর কি দশা হইল।

রাধামোহন শব্দার্থ ব্যাখ্যা যেমন প্রাঞ্জল, পদের অন্তর্নিহিত ভাবের মর্মোদ্ঘাটনেও তেমন তাঁহার অপূর্ব নৈপুণ্য।

যেমন, গোবিন্দদাসের অপর একটি পদ—

তরুণ অরুণ সিন্দুর-বরণ
নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে তা সঞে রোখয়ে
মানিনী বদন ফেরি॥

কানু হে রাইক ঐছন কাজ।
আট প্রহরে তো বিনু সাজই
আটহুঁ নায়িকা-সাজ॥

প্রাণ-সহচরী চরণে সাধই
কানু মানায়বি তোহি।
আঁখি মুদি কহে অবহুঁ মাধব
কাহে না মিলল মোহি॥

খঞ্জন-ধ্বনি শুনি উমতি ধাবই
তোহারি নূপুর মানি।
হাসি অভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই
শেজ বিছায়ই জানি॥

নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে
নিবিড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে কহই ঐছন
বেশ বনায়বি মোরি॥

কোকিল-রবে চমকি উঠয়ে
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙারি তোহারি গমন মথুরা
মুরছি পড়ল গোরি॥
নিঝর-নয়নে সব সখীগণে
খোঁজত বহে না শ্বাস।
তোহারি চরণে এতহুঁ কহিতে
ধাওল গোবিন্দ দাস॥[১]

এখানে দেখা যায়, রাধা দিনের আটপ্রহরে আটরকমের সাজে সাজিতেছেন। কি ভাবে তাহা সম্ভব, রাধামোহনের ব্যাখ্যায় তাহা সুস্পষ্ট—"অত্র প্রথমতঃ প্রাতঃসময়ে নীলাভাকাশে অরুণং দৃষ্ট্বা অন্যনায়িকাসিন্দূরযুক্তং ভবন্তং মত্বা খণ্ডিতা, 'প্রাণসহচরি' ইত্যাদিনা কলহান্তরিতা, 'নয়ন মুদি কহে' ইত্যাদিনা উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা চ। 'খঞ্জন ধ্বনি শুনি' ইত্যাদি চরণে বাসকসজ্জা। 'নীল নিচোল' ইত্যাদিনাভিসারিকা। 'ঘুমল তো সঞে' নিদ্রাযুক্তং ত্বাং মত্বেত্যর্থঃ অত্র স্বাধীনভর্তৃকা। 'কোকিল কলরব' ইত্যাদিনা প্রোষিতভর্তৃকা ইত্যষ্টৌ।' অর্থাৎ বিরহ-কাতরা শ্রীরাধা আটপ্রহরে খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা, অভিসারিকা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা—এই আট প্রকার নায়িকার সাজে সাজিতেছেন।

১ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৩৩১-৩২

সপ্তম অধ্যায়

স্বকীয়া-পরকীয়াতত্ত্ব

রাধাপ্রেম সম্বন্ধে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে স্বকীয়া-পরকীয়াতত্ত্ব।

প্রকট-লীলায় সকল রস অপেক্ষা মধুর রসেরই প্রাধান্য। ভগবান এখানে কান্ত, ভক্ত কান্তা। মধুর রসের স্থায়ীভাবে 'মধুরা' নামে রতি—"স্থায়ী ভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ।"

তারতম্য ভেদে রতি তিন প্রকার—সাধারণী; সমঞ্জসা ও সমর্থা।

উজ্জ্বলনীলমণি পাঠে জানা যায় যে, কৃষ্ণ-দর্শনে, তাঁহার সঙ্গলাভে আপন ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থ কামনায় যে রতি ভক্ত-হৃদয়ে জাগরিত হয়, তাহাই 'সাধারণী'। কুব্জার রতি হইল এই সাধারণী রতির দৃষ্টান্ত। 'সমঞ্জসা' রতি হইল পত্নীভাবের অভিমান। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতির কৃষ্ণের প্রতি যে রতি তাহাই হইল সমঞ্জসা রতি। ভক্ত-হৃদয়ে যে রতি স্বতঃসিদ্ধ, ভগবানের তৃপ্তিসাধনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, যাহার কাছে কুল, ধর্ম, লজ্জা, সংসার, সমাজ সব মিথ্যা হইয়া যায়, ভগবান যাহাতে বশীভূত হন, তাহাই 'সমর্থা' রতি। ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী-রাধার রতি সমর্থা। ইহারা কৃষ্ণের নিত্য-প্রিয়া। এই নিত্য প্রিয়াগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী ও রাধা এবং এই দুইজনের মধ্যে উচ্চতর আসন শ্রীরাধার।

কাজেই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবীয় মধুর রসের বৃন্দাবন-লীলায় স্থায়ীভাব 'সমর্থা' নামে 'মধুরা' রতি এবং এই লীলার নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা এবং প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী।

বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যহেতু নায়ক-নায়িকার চিত্তে উল্লাসের উপরে যে ভাব আরোহণ করে, তাহার নাম 'সম্ভোগ।'[১] সম্ভোগ দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য সম্ভোগ

---

১ উজ্জ্বলনীলমণি—অথ সম্ভোগঃ

আবার চারি প্রকারের,—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। যে ক্ষেত্রে লজ্জা, ভয় ও অসহিষ্ণুতাহেতু নায়ক-নায়িকা কর্তৃক ভোগাঙ্গ-সকল অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। সাধারণতঃ পূর্ব-রাগের পর এইরূপ সম্ভোগের সূচনা। নায়ক-কৃত বিপক্ষের গুণগান এবং স্ববঞ্চনাদির স্মরণ দ্বারা আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি উপকরণগুলি নায়িকার কাছে যেখানে সঙ্কীর্ণভাবে দেখা দেয় তাহাকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বলে। ইহা কতকটা তপ্ত-ইক্ষু চর্বনের মতো; অর্থাৎ একাকালেই স্বাদু এবং উষ্ণ। মানের উপশমে যে সম্ভোগ তাহাই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। প্রবাস হইতে আগত প্রিয়তমের সঙ্গে যে সম্ভোগ তাহাকে বলে সম্পন্ন সম্ভোগ। আর যথানে নায়ক-নায়িকা পরাধীনতাহেতু বিযুক্ত, এমন কি পরস্পরের দর্শনও যেখানে দুর্লভ, সেক্ষেত্রে উভয়ের যে উপভোগের আধিক্য, তাহাকে বলে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বাধা না থাকিলে সম্ভোগ সমৃদ্ধ হয় না। যে প্রেমের পথে বাধা নাই, সে প্রেমে তীব্রতাও নাই। সুতরাং সমর্থা রতির মধ্যেই পরকীয়ার বীজ নিহিত। জ্ঞানদাসের—

"ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি॥"

যে রতিকে আকৃতি দিয়া ফিরিতেছে, অথবা চণ্ডীদাসের—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥

যে রতিকে দিব্যোন্মাদের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, স্বকীয়ার সমঞ্জসা রতিতে তাহা সম্ভবপর নহে, ইহা পরকীয়া রাধার সমর্থা রতি। এখানেও দেখা যায়, বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভিতর দিয়া রাধার পরকীয়াত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাধার এই পরকীয়া-প্রেমের বিষয় লইয়া বিভিন্ন কালে বিভিন্ন উপাখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান হইল এই, বৃষভানু-কন্যা রাধা আয়ান ঘোষের (বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের গ্রন্থে আয়ান ঘোষকে অভিমন্যু-নামে পাওয়া যায়) বিবাহিতা স্ত্রী। এই আয়ান ঘোষ ছিলেন গোপরাজ মাল্যকের পুত্র, জটিলা তাঁহার মা। তাঁহারা তিন ভাই—তিলক, দুর্মদ ও আয়ান এবং তিন বোন— যশোদা, কুটিলা ও প্রভাকরী। যশোদার ভাই বলিয়া আয়ান ঘোষ হইলেন কৃষ্ণের মামা, এবং রাধিকা কৃষ্ণের মামী। চন্দ্রাবলীও ভরুণ্ডার পুত্র গোবর্ধন মল্লের স্ত্রী। কাজেই তিনিও পরোঢ়া গোপ-রমণী। সুতরাং সর্বত্রই পরকীয়াবাদের প্রতিধ্বনি।

তবে এই পরকীয়া, লৌকিক পরকীয়া নহে। ভক্ত ও ভগবানে যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে লৌকিক প্রশ্ন অবাস্তব। ইহা যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দার্শনিক। শৃঙ্গার রসে পরোঢ়া নারী, অন্য আলঙ্কারিকগণ নিষিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও ("পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বা"—সাহিত্য দর্পণ, "ন অন্যোঢ়া"—দশরূপক) অপ্রাকৃত ব্রজ-গোপীগণের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। তাহার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ নরাকাররূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহ। সৎ-এর শক্তি 'সন্ধিনী', চিৎ-এর 'সম্বিৎ' এবং আনন্দের 'হ্লাদিনী'।[১] রাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি হ্লাদিনী শক্তির মানবী রূপ। ইহাদের মধ্যে হ্লাদিনীর সার অর্থাৎ পূর্ণতম প্রকাশ হইলেন শ্রীরাধা। কাজেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার মানে হইল সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আপন আনন্দেরই অভিনব উপায়ে আস্বাদন। লৌকিক সম্পর্কগুলি মায়িক ছাড়া আর কিছুই নহে এবং ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বিৎ-শক্তির

---

১ সৎ চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥—চৈতন্য-চরিতামৃত
—মধ্য-লীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ—ডঃ সুকুমার সেন সং (১২৬৩), পৃঃ ১৮৬

অন্যতম প্রকাশ যোগমায়ার সৃষ্টি। কাজেই তত্ত্বের দিক হইতে রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির প্রকাশ বলিয়া স্বকীয়া এবং লৌকিক দৃষ্টিতে রাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী বলিয়া পরকীয়া। জীব সংসারের সহস্র বন্ধনে বাঁধা বলিয়া জগতের স্বকীয়, ভগবানের পরকীয়। ভগবানের ডাকে সাড়া দিতে হইলে সংসার-বন্ধন শিথিল করিয়া বাহির হইতে হয়। ইহাই পরকীয়ার অভিসার। বিষয়টি বিভিন্ন গ্রন্থে আচার্যগণ কিভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাক।

ভাগবত

রাস-লীলার বর্ণনায় দেখা যায়, পরোঢ়া গোপীগণ জার-বুদ্ধিতেই কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন।[১] কৃষ্ণ-চরিত্রে অসীম শ্রদ্ধাশীল ধর্মনিষ্ঠ পরীক্ষিত ইহার কারণ জানিতে চাহিলে বিরক্ত-শিরোমণি শুকদেব বলেন,—সর্বভূক অগ্নির যেমন কিছুতেই মালিন্য দোষ ঘটে না, সেইরূপ তেজস্বিগণের পক্ষে কিছুই দোষের নহে—"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"[২] তখন পর্যন্ত পরকীয়াবাদ কোন তত্ত্বরূপে গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই শুকদেবের পক্ষে এমন সহজভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। সাধারণ সামাজিকের মনে এই বলিয়া বুঝ দিলেও তত্ত্বের দিক হইতে ইহার সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজনবোধে তিনি আবার বলেন—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব[৩] দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥[৪]

যিনি গোপীগণের, তাঁহাদের পতিগণের এবং দেহধারী সকল জীবের অন্তরে বিচরণ করেন, তিনিই সকলের নয়নগোচর হইয়া লীলার জন্য দেহধারণ করিয়াছিলেন। কাজেই বুঝিতে হইবে, তিনি আমাদের মতো দেহধারী নন, পরমাত্মারূপে সকল জীবের দেহরূপ আধারে

১ ভাগবত, ১০।২৯।১১
২ ঐ ১০।৩৩।২৯
৩ পাঠান্তর—'সর্ব্বেষাঞ্চৈব'।
৪ ঐ ১০।৩৩।৩৫

অবস্থান করিয়া নিজেই নিজের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সুতরাং বহির্দৃষ্টিতে যাহা গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিহার, অন্তর্দৃষ্টিতে তাহাই কৃষ্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের বিহার। এক্ষেত্রে পরদারাভিমর্শনের কোন প্রশ্নই উঠে না।

এই প্রসঙ্গে রাস-লীলার অপর একটি শ্লোকও স্মরণ করা যাইতে পারে—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান স্বান স্বান দারান্ ব্রজৌকসঃ॥[১]

এখানেও দেখা যায়, গোপগণ কৃষ্ণের প্রতি কখনও অসূয়া প্রকাশ করিতেন না। কেননা যোগমায়ার প্রভাবে সর্বদা তাঁহারা নিজ নিজ পার্শ্বস্থিতা ছায়া-গোপীমূর্তিকে নিজ-পত্নী বলিয়া অভিমান করিতেন। এই শ্লোকের 'বৈষ্ণব-তোষণী' টীকাতেও ইহাই বলা হইয়াছে—

"যোগমায়াকল্পিতানামন্যাসামেব তৈর্বিবহনং
সংপ্রবৃত্তং নতু ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীনামিতি।"

যদি কেহ সন্দেহ করেন, গোপগণের সহিত গোপীদিগের যখন পতী-পত্নীত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন অবশ্যই তাঁহাদের বিবাহও হইয়াছিল। সেই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করা হইল, যোগমায়া-কল্পিত অন্য ছায়া মূর্তির সহিত গোপগণের বিবাহ হইয়াছিল, কৃষ্ণ-প্রেয়সিগণের সঙ্গে নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গোপীগণ কৃষ্ণের নিত্য-প্রেয়সী এবং বাহ্যতঃ তাঁহাদের অনূঢ়া-কন্যাত্ব বা অন্য গোপ-গণের স্ত্রীত্ব যোগমায়া-বিঘটিত প্রাতিভাসিক সত্য ছাড়া আর কিছুই নহে। কাজেই পরকীয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

রূপ গোস্বামী

রূপ গোস্বামীর নাটকাদি এবং অপরাপর রচনা পাঠে দেখা যায়, তিনিও তত্ত্বতঃ পরকীয়াবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার ললিত-মাধব নাটকের "পূর্ণমনোরথ" নামক দশম অঙ্কে দেখা যায়, দ্বারকার

---

১ ভাগবত, ১০।৩৩।৩৭

নব-বৃন্দাবনে সত্রাজিৎ-রাজ-তনয়া সত্যভামা-রূপিণী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিধিমত বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহ-বাসরে সতী-শিরোমণি অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, শচীদেবী-সহ ইন্দ্রাদি দেবগণ, বৃন্দাবনের নন্দ-যশোদা, শ্রীদামাদি সখাগণ, ভগবতী পৌর্ণমাসী প্রভৃতি এবং দ্বারকার বসুদেব-দেবকী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঘটনাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া সত্যভামা-নামের ছদ্মবেশে দ্বারকায় আসিলেও অর্থাৎ ধাম পরিবর্তন করিলেও রাধার স্বরূপগত ভাবের—সমর্থা রতির—কোনও পরিবর্তন হয় নাই। তাই দেখা যায়, বৃন্দাবন-লীলাই যে লীলাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতমাধব নাটকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তিতেই তাহা সুব্যক্ত—

> যা তে লীলারসপরিমলোদগারিবন্যাপরীতা
> ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
> তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
> সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্॥[১]

অর্থাৎ "সমস্ত মাধুরীর সারভূতা মাধুর্য্য-রসময়ী মহামাধুরীতে পরিপূর্ণা—তোমার লীলা বিহারের মধুময় গন্ধবিস্তারকারিণী ভূমণ্ডলের মধ্যে যে ধন্যা শ্রীবৃন্দাবনভূমি বর্ত্তমান, সে স্থানে আমরা চটুলা গোপীগণের ভাবমুগ্ধ অন্তরে তোমার সহিত নিসঃঙ্কোচে যে ক্রীড়া করিয়া থাকি, তাহা অন্যত্র অসম্ভব, অতএব সেই স্থানে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হাস্যবদনে তুমি বংশীধ্বনি করিয়া থাক।"

রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটকেএই সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে দেখা যায়, অভিমন্যুগোপের (আয়ান ঘোষের) সহিত রাধার বিবাহ সত্য বিবাহ নহে। অভিমন্যু গোপকে বঞ্চনা করিবার জন্যই যোগমায়া এই বিবাহকে সত্যের ন্যায় প্রতীতি করাইয়াছেন এবং রাধাদি সকলেই কৃষ্ণের নিত্য-প্রেয়সী—

১ ১০ম অঙ্ক, শ্লোক ৩৬

"তদ্‌বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্। নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য।"[১]

উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদ প্রকরণে কৃষ্ণের ঔপপত্য আলোচনাকালে রূপ গোস্বামী স্বীকার করিয়াছেন যে, এই ঔপপত্যেই শৃঙ্গারের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত—"অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।"[২] এই প্রসঙ্গে তিনি মহামুনি ভরতের মত উল্লেখ করিয়াও দেখাইয়াছেন যে, এই প্রচ্ছন্নকামুকত্বেই মন্মথের পরমারতি—

বহু বার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
যাচ মিথোদুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥

তবে এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি।[৪]

অর্থাৎ প্রেমের এই ঔপপত্য সম্বন্ধে যে লঘুত্বের (নিন্দার) কথা বলা হইল, প্রাকৃত নায়ক-পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য, মধুর রস আস্বাদনের জন্য যিনি অবতীর্ণ, সেই কৃষ্ণের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শৃঙ্গার রসে পরোঢ়া নারী অন্য আলঙ্কারিকের মতে নিষেধ থাকিলেও অপ্রাকৃত ব্রজগোপীগণের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। বিষয়টি রূপ গোস্বামী তাঁহার পূর্ববর্তী কোন প্রাচীন আচার্যের মত উল্লেখ করিয়া আরও পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন—

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্দেগাকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥[৫]

১ ১ম অঙ্ক, শ্লোক ২৪

২ উজ্জ্বলনীলমণি--নায়কভেদঃ, শ্লোক ১৩

৩ ঐ, নায়কভেদঃ—শ্লোক ১৫

৪ ঐ, নায়কভেদঃ—শ্লোক ১৬

৫ ঐ, নায়িকাভেদঃ—৩য় শ্লোক

অর্থাৎ প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে মুখ্যরসে পরকীয়া রমণীকে অনভিপ্রেত বলিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত নায়িকা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ব্রজদেবীগণের পক্ষে ইহা নিষেধ বলিতে পারা যায় না। কেননা রসবিশেষের আস্বাদনের জন্য রসিক-মণ্ডল-শেখর কংসারি কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অবতারিত করাইয়াছেন।

জীব গোস্বামী

উজ্জ্বলনীলমণির নায়ক-ভেদ প্রকরণের "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং..." শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া 'লোচন-রোচনী' টীকায় জীব গোস্বামী স্বকীয়া-পরকীয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। অন্যত্রও তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সব মতামত হইতে জানা দেখা যায়, জীব গোস্বামী তত্ত্বতঃ পরকীয়াবাদ স্বীকার করেন নাই। জীব গোস্বামীর মতে মধুর-রসবিশেষ আস্বাদনের জন্যই কৃষ্ণাবতার।[১] অবশ্য জগতের ভারাবতারণের জন্যও তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে এই ভারাবতারণ দেবতাদের ইচ্ছায় করা হইয়াছে; কিন্তু এই ঔপপত্য নিজের ইচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে।[২] তিনি বলেন যে, ভাগবতের উদ্ধব-বাক্য হইতে জানা যায়[৩] যে, কৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীগণের নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া তাঁহাদের পরকীয়াত্ব সঙ্গত হয় না এবং এই জন্যই প্রকট-লীলাকালে পরকীয়াত্বের প্রতীতি মায়িকী ছাড়া আর কিছুই নহে। কৃষ্ণের সহিত ব্রজ-গোপীগণের নিত্য-দাম্পত্যসম্বন্ধ বলিয়াই প্রকট-লীলার শেষে মায়িক-পরকীয়াত্ব আর থাকে না। কাজেই পরম-স্বকীয়াতেই

১ "রসনির্যাসেতি রসনির্যাসো রসসারঃ মধুররসবিশেষ ইত্যর্থঃ।" উজ্জ্বলনীলমণি-নায়কভেদঃ—শ্লোঃ-১৬ (লোচনরোচনী-টীকা)

২ "অত্র ভারাবতারণং দেবাদীনামিচ্ছয়া তদিদন্তু ঔপপত্যন্তু তস্য স্বেচ্ছয়েতি হি গম্যতে।"—উজ্জ্বলনীলমণি—নায়কভেদ প্রকরণের ১৬নং শ্লোকের "লোচন-রোচনী" টীকা।

৩ "তদেবং শ্রীমদুদ্ধববাক্যে....তাসাং তেন নিত্যসম্বন্ধাপত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন সঙ্গচ্ছতে।" উজ্জ্বলনীলমণি—নায়কভেদঃ—শ্লোক ১৬ (লোচনরোচনী টীকা)

রাধা-প্রেমের চরমোৎকর্ষ এবং স্বরূপে অর্থাৎ অপ্রকট-লীলাতেও কৃষ্ণের ঔপপত্যের লেশ মাত্র নাই। তাই জীব গোস্বামী তাঁহার 'গোপালচম্পু'তে (উত্তর চম্পুতে) রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ সংঘটিত করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধকে নিত্য-দাম্পত্যে পর্যবসিত করিয়াছেন।

তবে জীব গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির উপরি-উক্ত "লঘুত্বমত্র যৎ-প্রোক্তং…" শ্লোকের টীকায় পরকীয়াবাদের বিরুদ্ধে যত আলোচনা করিয়াছেন, সব আলোচনায় শেষে একটি সংশয়-উদ্রেককারী শ্লোক রাখিয়া গিয়াছেন—

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎ পূর্ব্বমপরংপরম্॥

অর্থাৎ এই স্বকীয়া-পরকীয়াবাদের আলোচনায় স্বেচ্ছাক্রমে কিছু এবং পরের ইচ্ছাযও কিছু লিখিত হইয়াছে। পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত অংশই স্বেচ্ছাক্রমে এবং যেস্থলে পরস্পর সম্বন্ধশূন্য, তাহাই পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল বুঝিতে হইবে। হরিদাস দাস লিখিয়াছেন,[১] জয়পুরে শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে ১৬৭৩শকে (= ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত একখানি পুঁথিতেও এই শ্লোকটি দেখা যায়। কাজেই তিনি শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন না। দেখা যাইতেছে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও "লঘুত্বমত্রযৎ প্রোক্তং…" শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে[২] জীব গোস্বামী পরেচ্ছায়ও কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিত্য-পরকীয়াত্বে সমর্থন আছে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জীব গোস্বামী যে তত্ত্বতঃ পরকীয়াবাদ কোথায়ও সমর্থন করেন নাই, ইহা তাঁহার রচনাসমূহ পাঠে বিশেষভাবে বুঝা যায়। কাজেই উজ্জ্বলনীলমণির উপরি-উক্ত শ্লোকের টীকায় সর্বত্রই বিশেষ সামঞ্জস্যের সহিত স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিয়া কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকই এইরূপ একটি খাপছাড়া শ্লোক লিখিতে পারেন না। সুতরাং শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই আমাদের ধারণা।

১ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—পৃঃ ২০১ (প্রথম খণ্ড)
২ 'আনন্দ-চন্দ্রিকা' টীকা

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায়, কবিরাজ গোস্বামীও তত্ত্বতঃ পরকীয়াবাদ সমর্থন করেন নাই। তিনি বলেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥[১]

এখানে দেখা যায়, পরকীয়াতেই প্রেমের সর্বাধিক স্ফুরণ। কাজেই প্রেমের ভিতরে শ্রেষ্ঠ হইল কান্তা প্রেম এবং তাহার ভিতরেও শ্রেষ্ঠ হইল পরকীয়া রতি। কিন্তু পরস্ত্রীতে মূলে রস না হওয়ায় পরকীয়া-ভাবের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে হইতে পারে বলিয়া কেহ সন্দেহ করিতে পারেন বিবেচনায় বলা হইল, "ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।" ফলিতার্থ হইতেছে, ব্রজভিন্ন অন্য কোথায়ও স্বকীয়ায় পরকীয়াভাব না হওয়ায় অর্থাৎ প্রকৃত পরকীয়া হওয়ায় তাহাতে রস হয় না। এই জন্যই দর্পণকার বলিয়াছেন,—'পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বা'। বস্তুতঃ ব্রজের ঔপপত্য একটি অসাধারণ ভাব, যেখানে ব্রজ-গোপীগণ ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ-শক্তির চিন্ময়ী মূর্তি হইয়াও পরকীয়ারূপে প্রতিষ্ঠিতা।

কবিরাজ গোস্বামীর মনের এই ভাবটির আরও পরিস্ফুরণ হইয়াছে কৃষ্ণের প্রকট-লীলা বর্ণনায়—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥[২]

এখানে দেখা যায়, যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজদেবাগণের উপপতিভাব লইয়া যে লীলা, তাহা প্রকট-লীলারই বিশেষত্ব, বৈকুণ্ঠাদিতে এইরূপ কোন লীলার অবকাশ নাই। কাজেই বৈকুণ্ঠাদির লীলা অপেক্ষা

১ আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত সং (১৯৬৩), পৃঃ ১৩
২ চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ডঃ সুকুমার সেন সং (১৯৬৩) পৃঃ ১২

কৃষ্ণাবতারেই লীলার অধিকতর রস-বৃদ্ধি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ-লীলায় পরকীয়ার ভান রস-পরিপাটির জন্যই একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

যদুনন্দন দাস

যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দে'[১] লিখিত আছে—

এই সব নির্দ্ধার করি শ্রীদাসগোসাঞি।
নিয়ম করি কুণ্ডতীরে বসিলা তথাই॥
সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ।
দিবানিশি কৃষ্ণকথা সদা অবিরত॥
হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপালচম্পু নাম।
সবে মেলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম॥
আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ উল্লাস।
অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ॥
বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া।
ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া॥
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া।
বহির্লোকে বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥

যদুনন্দন দাস শ্রীজীবের মতামত সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দিলেও এ-সম্বন্ধে স্বয়ং-শ্রীজীবের যাহা মতবাদ তাহা পূর্বেই-আলোচনা করা হইয়াছে। সে-সব আলোচনার পুররুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। এ-সম্বন্ধে ডক্টর সুশীলকুমার দে'র মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"This view of Yadunandana is not un-expected, for in his time the efforts of S'yamananda and S'rinivasa (both disciples of Jiva) had made the Parakiya doctrine wride-spread. S'rinivasa's descendant, Radhamohana Thakura, became a formidable champion of this doctrine...It would be un-historical

১ ৪র্থ নির্যাস, বহরমপুর সং (বঙ্গাব্দ—১২৯৮), পৃঃ ৮৮

to read a doctrine which developed and became established in later times into the works of the Vrndavana Gosvamins, but the motive is obvious."[১]

রূপ কবিরাজ

রূপ কবিরাজ ছিলেন চরম পরকীয়াবাদী প্রখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার রচিত-'সার-সংগ্রহ'-গ্রন্থে এই মতবাদ বিবৃত হইয়াছে। 'এই গ্রন্থ ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রীর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

রূপ কবিরাজ নিত্য-পরকীয়াত্ব সম্বন্ধে আস্থাবান। তিনি প্রকট- ও অপ্রকট লীলার মধ্যে স্বরূপগত কোন ভেদ স্বীকার করেন না।[৩] তিনি বলেন, জীব গোস্বামীর নিত্য-পরকীয়াত্বে সমর্থন আছে। কেননা "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং···" শ্লোকের 'লোচন-রোচনী' টীকার শেষে 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং-কিঞ্চিৎ ··,' ইত্যাদি শ্লোক লিপিবদ্ধ থাকায় স্পষ্টই বুঝা যায়, স্বকীয়া মত তাঁহার-নিজের মত নহে, পরকীয়া মতই তাঁহার নিজস্ব।[৪]

রূপ কবিরাজ-বলেন, 'গোপাল তাপনী'তে "স বো হি স্বামী ভবতি-" এই বাক্যে-"স্বামী" শব্দ পরিণেতৃ বাচক নহে, নেতৃবাচক-- "ন পরিণেতৃবাচকঃ কিন্তু নেতৃবাচকঃ।"[৫] তাঁহার মতে অপ্রকট-লীলায় যদি-পরকীয়াত্ব স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে রসোৎকর্ষের হানি হয়—"অতোঽপ্রকটলীলায়াং পরকীয়াত্বাভাবে তত্তদভাবাদ্রসোৎকর্ষহানিঃ স্যাৎ।"[৬]

১ Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, (1942) পৃঃ ২৬৫

২ রূপ কবিরাজ—"সার সংগ্রহ", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত (আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা—নং ৩)

৩ ঐ—ভূমিকা, পৃঃ XXXIX

৪ ঐ—পৃঃ ১২৩-১২৪

৫ ঐ—পৃঃ ১৩৩

৬ ঐ—পৃঃ ১২৫

এই রূপ কবিরাজের পরিচয়-প্রসঙ্গে নানা রকম কাহিনী প্রচলিত আছে। 'সার-সংগ্রহে'র ভূমিকায় বলা হইয়াছে, রূপ কবিরাজ কাহারও কাহারও মতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর খুল্লতাত এবং শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বলিয়া কথিত।[১] প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কিন্তু এই সব উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। ভক্তি-রত্নাকর, অনুরাগবল্লী, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে রূপ কবিরাজের পরিচয় মেলে। ভক্তি-রত্নাকর (১০ম তরঙ্গ)[২] পাঠে জানা যায়, শ্রীনিবাস আচার্য যখন কাঞ্চনগড়িয়া হইতে গণসহ খেতরি উৎসবে যাত্রা করেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে ভগবান কবিরাজের ভ্রাতা রূপও ছিলেন—

ভগবান কবিরাজ গুণের আলয়।
যাঁর ভ্রাতা রূপ নিমুবীর ভৌমালয়॥

অনুরাগবল্লীতে (৭ম মঞ্জরী) শ্রীনিবাস আচার্যের শাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গেও রূপ কবিরাজের উল্লেখ আছে—

বীরভূমি মধ্যে বৈদ্যরাজ তিনজন।
তাঁর মধ্যে ভগবান কবিরাজ অগ্রগণ্য॥
তাঁর ছোট শ্রীরূপ কবিরাজ নাম।

*　　*　　*

এখানে দেখা যায়, রূপ কবিরাজ জাতিতে বৈদ্য, বাড়ী বীরভূমে এবং তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। কথিত আছে, রূপ কবিরাজ পরকীয়াবাদ প্রচারের ফলে গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হইয়া এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন এবং বিরুদ্ধবাদীরা এই সম্প্রদায়ের নাম দিয়াছিল 'আতবাধি'। ইহাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ডক্টর কৃষ্ণগোপাল শাস্ত্রীও বলিয়াছেন—

"...this is a piece of information about which there is little authentic testimony."[৩]

---

১ ঐ—ভূমিকা, পৃঃ XLIII
২ গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), শ্লোক ১৩৮
৩ সারসংগ্রহ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ভূমিকা, পৃঃ XLIII

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, যদুনন্দন আচার্য এবং রূপ কবিরাজ উভয়েই প্রায় সমসাময়িক কালের লোক। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যদুনন্দন আচার্যের কর্ণানন্দে পরকীয়াবাদের ছাপ আছে। কাজেই যদুনন্দন দাসকে যখন বৈষ্ণব-সমাজ বিতাড়িত করেন নাই, তখন রূপ কবিরাজকে বিতাড়িত করিবার কথা সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হয়। আর 'অতিবাধি' বা 'আতিবড়ী' সম্প্রদায় রূপ কবিরাজ প্রবর্তন করেন নাই, উড়িষ্যার পুরী জিলার ভগবান পাণ্ডার পুত্র জগন্নাথ দাস এই সম্প্রাদায়ের প্রবর্তক। এ সম্বন্ধে পরে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিব বলিয়া এখানে এ বিষয়ে আর বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই ব্রজ-গোপীগণের পরকীয়া ভাব। তিনিও "আনন্দচন্দ্রিকা" নাম দিয়া উজ্জ্বলনীলমণির টীকা রচনা করিয়া "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং...." ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাঁহার মতামত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিনি বলেন, ঔপপত্য প্রাকৃত নায়কের পক্ষেই অধর্মজনক, ধর্মাধর্ম-নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণে সে আশঙ্কার স্থান নাই- "ন তু কৃষ্ণে ধর্ম্মাধর্ম্মনিয়ন্তৃ-চূড়ামণীন্দ্র" প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাতে অধর্ম স্পর্শ হইলেও যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে সমর্থ এরূপ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে বা তাঁহার মহাশক্তিসমূহের মুখ্যতমা হ্লাদিনী শক্তিরূপা গোপীগণে আদৌ এ দোষ নাই।

বিশ্বনাথের মতে প্রকট লীলা মায়িক নহে এবং প্রকট-অপ্রকট-লীলার মধ্যে কিছু ভেদ নাই। কৃষ্ণ যখন তাঁহার লীলা-মাধুর্য লোকচক্ষুর গোচরীভূত করান, তখন তাহা প্রকট লীলা এবং লীলা-প্রপঞ্চ লোক-চক্ষুর অন্তর্হিত হইলেই তাহা অপ্রকট-লীলা নামে অভিহিত হয়।

বিশ্বনাথের মতে অপ্রকট-লীলা নিত্যদাম্পত্যময়ী এবং প্রকট-

লীলা মায়িক ও পরোঢ়া-উপপতি-ভাবময়ী—এরূপ মনে করা অসঙ্গত। কেননা রাসলীলার আদি, অন্ত্য ও মধ্যে পরোঢ়া-উপপতিভাব বিরাজমান। ভাগবতে রাসলীলার বর্ণনায় আছে—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীত কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজবল্লবীনাম্‌॥[১]

অর্থাৎ, রাস-লীলা উৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের কণ্ঠ-ভুজবন্ধনে বেষ্টিত করিয়া তাঁহাদিগকে যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার নিতান্ত-অনুগতা লক্ষ্মীও সেরূপ অনুগ্রহ পান নাই, পদ্মকান্তি-স্বর্গাঙ্গনাগণও পান নাই, অন্য রমণীগণের তো কথাই নাই। এখানে দেখা যায়, স্বয়ং লক্ষ্মী অপেক্ষাও ব্রজদেবাগণের উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। রাসলীলা মায়িক হইলে এই উৎকর্ষ স্থাপন অবাস্তব হইয়া পড়ে এবং রাসলীলার উপাদেয়ত্ব থাকে না। বিশেষতঃ রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্ব-মুখ নিঃসৃত বাণী হইতেছে—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্‌ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥[২]

এই শ্লোকের 'যা মাঽভজন্‌ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ' পদও উপপতিত্ব প্রতিপাদক। গোপীগণ গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার প্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণ অক্ষম। অতএব গোপীপ্রেমে তিনি বশীভূত। ইহাই নিত্য সত্য। রাসলীলা মায়িক হইলে ইহা অবাস্তব হইয়া পড়ে। যদি বলা হয়, এইরূপ বাক্য গোপীগণের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে পরম মায়াবী ছাড়া আর কিছুই নহেন, তাহা

১ ভাগবত, ১০।৪৭।৬০
২ ঐ, ১০।৩২।২২

হইলে উদ্ধব এই অনিত্য বিষয়ে ভজনার পরাকাষ্ঠাত্ব স্থাপন করিয়া গোপীগণের প্রেমোৎকর্ষ স্বীকার করিতেন না।[১] দশাক্ষর এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থও পরোঢ়া উপপতিভাবময়। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান এবং মন্ত্রেও পরকীয়াভাব বর্তমান। সাধকগণ ধ্যান-পাকদশাতে প্রকট-লীলার ভাবসমূহই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং লীলা মায়িক হইতে পারে না। 'লীলা' অনিত্য হইলে ভগবানের 'নাম'ও অনিত্য হইয়া যায়। কাজেই ভজনের যাহা সার তাহাও মায়িক হইয়া পড়ে। গোপালতপনীতে "স বো হি স্বামী ভবতি"--এই বাক্যে 'স্বামী' শব্দ পরিণেতৃবাচক নয়, ঐশ্বর্যবোধক।[২] রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা হ্লাদিনী-শক্তি। তবে লীলাবিশিষ্ট রাধা-কৃষ্ণই আমাদের ভজনীয়, লীলাবিরোহিত রাধা-কৃষ্ণ আমাদের ধারণা ও ভজনের অতীত। মহাভাবময়ী গোপীগণেব কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ অচিন্ত্য অনুরাগের ফল। ইহার জন্য তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে এই কষ্টকে তাঁহারা কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। অনুরাগের ইহাই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহাভাবময়িগণের এই অলৌকিক অনুরাগ জীব গোস্বামীরও যে একান্ত অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্যই তিনি "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ..." শ্লোকটি লিখিয়াছেন। কাজেই ঔপপত্য-সম্বন্ধ শ্রীজীব গোস্বামীরও অভিপ্রেত।

বলদেব বিদ্যাভূষণ

রাধা-কৃষ্ণের উপপতিভাবে লীলা পরমেশ্বরত্বনিবন্ধন বুঝিতে হইবে। মানুষের ন্যায় এই লীলা কর্ম-পরতন্ত্র নহে, জন-মনোনিবেশের

১ আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ভাগবত, ১০।৪৭।৬১

২ "স্বামিন্নৈশ্বর্যে ইতি পাণিনিস্মরণাৎ"।

জন্যও এই লীলা নহে। লীলা-মাধুর্যই অন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়। এইজন্যই তাঁহাদের ঔপপত্য সাবধানে বিচার করা প্রয়োজন।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির অভিব্যক্তি। কাজেই তাঁহাদের সহিত লীলা-বিনোদে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামত্বের হানি হয় না।[১]

স্বকীয়াত্ব-নিরাস বিচার

জয়পুরের গ্রন্থাগারে দশ পৃষ্ঠার একখানি খণ্ডিত পুঁথি এবং বৃন্দাবনের গোবর্ধন ভট্টজীর গ্রন্থশালায় ছয় পৃষ্ঠার একখানি পুঁথি আছে। এইসব পুঁথিতে স্বকীয়াবাদ নিরাস করিয়া পরকীয়াবাদ স্থাপন করা হইয়াছে।[২]

পরকীয়া-রস-স্থাপন সিদ্ধান্ত সংগ্রহ

নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য গিরিধর দাস-রচিত এই গ্রন্থখানি শ্রীখণ্ডে রাখালানন্দ ঠাকুরের পাটে রক্ষিত আছে। ইহাতে পরকীয়াবাদ স্থাপিত হইয়াছে।[৩]

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য (১ম খণ্ড) পৃঃ ২০৪
২ ঐ—পৃঃ ২০৬
৩ ঐ—পৃঃ ২০৬

অষ্টম অধ্যায়

উপ-সম্প্রদায়

পূর্বাধ্যায়ে স্বকীয়া-পরকীয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল তাহাতে দেখা যায় যে, জীব গোস্বামীর পরবর্তীকালে পরকীয়াবাদ পরমতত্ত্বরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কি, পরবর্তীকালের আচার্যগণ জীব গোস্বামীকেও পরকীয়াবাদী প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তবু বলিতে হয়, এই ভিন্ন মতবাদ দার্শনিক চিন্তাধারা হইতেই উদ্ভূত—প্রাকৃত জীব-জগতের আচার-ব্যবহারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

তত্ত্বের দিক ছাড়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায়, প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের অসংখ্য বৈষ্ণব-কবির রচনায় লীলা-মাধুর্য বর্ণনার ভিতর দিয়া রাধার পরকীয়াত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তখন আর শুধু তত্ত্ব-কথায় ইহাকে চাপা দেওয়ার উপায় ছিল না। কাজেই রাধা-কৃষ্ণ লীলার ক্রম-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পরকীয়াবাদও এদেশে ক্রম-প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইতিমধ্যে সপ্তদশ শতকের দিকে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এক প্রকার আদি-রসাত্মক ভাবের সাধনা প্রচার করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে ইহা নাগরীভাবের সাধনা বা গৌর-নাগর সাধনা নামে পরিচিত। নরহরি, লোচন দাস প্রভৃতি ছিলেন এই ভাবের সাধক। তাঁহারা নিজেদের নাগরী এবং গৌরাঙ্গকে নাগররূপে দেখিতেন। ইহাদের নিকট মুণ্ডিত-মস্তক শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা চাঁচর-চিকুরধারী শ্রীগৌরাঙ্গই ছিলেন অধিকতর আকর্ষণের পাত্র।

নরহরি সরকারেরা ছিলেন তিন ভাই—

—ভাগ্যবন্ত নারায়ণ দাসের নন্দন।
মুকুন্দ, মাধব, নরহরি তিনজন॥[১]

১ ভক্তিরত্নাকর, ১১শ তরঙ্গ, গৌড়ীয় মিশন সং, পৃঃ ৪৫৪

পিতা নারায়ণ দাসের মৃত্যুর পর মুকুন্দ নবদ্বীপে নরহরির অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গৌড়ের বাদশাহের গৃহচিকিৎসকরূপে গমন করেন। অল্প দিনের মধ্যেই নরহরি সু-পণ্ডিত ও পরম ভক্ত বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গলাভের পূর্বে তিনি সংস্কৃত এবং বাঙলায় শ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলাবিষয়ক পদাবলী রচনা করিতেন।

অতঃপর ইনি এবং গদাধর পণ্ডিত নিরন্তর চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। চামর-ব্যজন দ্বারা সেবা করাতেই নরহরির অধিকতর আগ্রহ—"নরহরি চামর ঢুলায়।"

শ্রীখণ্ডে নরহরি-প্রতিষ্ঠিত গৌর-মূর্তি অদ্যাপি সেবিত হইতেছেন। নরহরির অগ্রজ মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ছিলেন নরহরির বিশেষ অনুরাগী। শ্রীখণ্ডকে ইঁহারাই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিণত করেন। নরহরির পর রঘুনন্দন শ্রীখণ্ডের নেতা হন। রঘুনন্দন তিরোধানের পূর্বে শ্রীনিবাস আচার্যকে বৈষ্ণব-ধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

—আইসে সময় ইথে বিষম হইব।
সবাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিব ॥[১]

এইজন্য আশ্বাস দিয়া শ্রীনিবাসকে আশীর্বাদ করিয়া বলেন—

নহিবে চিন্তিত ইথে– প্রভু গৌররায়।
সাধিব অনেক কার্য্য তোমার দ্বারায় ॥
চিরজীবী হইয়া রহিবে পৃথিবীতে।
রাখিবে প্রভুর ধর্ম্ম স্ব-গণ সহিতে ॥
তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ-বহির্মুখগণ।
হইবে উন্মুখ লৈয়া তোমার শরণ ॥[২]

রঘুনন্দনের পর নেতা হন তাঁহার পুত্র ঠাকুর কানাই। তিনি শ্রীখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের বামে বিষ্ণুপ্রিয়া-মূর্তি স্থাপিত

---

১ ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ তরঙ্গ গৌড়ীয় মিশন সং, পৃঃ ৬২১
২ ঐ, ১৩শ তরঙ্গ, গৌড়ীয় মিশন সং, পৃঃ ৬২১

করেন। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্তির ছিলেন অধিকতর পক্ষপাতী। শুধু তাহাই নহে। তাঁহারা মনে করিতেন গদাধর গৌরাঙ্গের প্রকৃতি। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া নরহরি ও তাঁহার শিষ্যেরা গৌর-গদাধরের যুগল উপাসনাও অনুমোদন করেন বলিয়া শোনা যায়।

নরহরি-রঘুনন্দনের "গৌর-নাগর" মতবাদ এক শ্রেণীর বৈষ্ণবের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও শ্রীনিবাস-নরোত্তম এবং শান্তিপুর, খড়দহের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাহা সমর্থন করিতেন না। তাহার কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন মূলতঃ রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হইয়াছিল। কাজেই বৃন্দাবন-গোস্বামিগণের মতবাদই ছিল সকল বৈষ্ণবের আশ্রয়স্থল। তবে সকলেই শ্রীখণ্ডকে দেখিতেন পরম শ্রদ্ধার চক্ষে। বিশেষতঃ বৃদ্ধ নরহরি তো ছিলেন সর্বজনমান্য পরমবৈষ্ণব। নাগরী-ভাবের সাধনার পটভূমিকায় যে ঐকান্তিকতা ছিল, সকল বৈষ্ণবই তাহার সাত্ত্বিক গৌরব অবশ্যই স্বীকার করিতেন। তবে নাগরী-ভাবের সাধনা ছিল আবেগ-উচ্ছল। কাজেই ব্যক্তিবিশেষের নিকট ইহা আদরণীয় হইলেও সর্ব-সাধারণের পক্ষে ইহা উপযুক্ত ছিল না। কাজেই অনধিকারীর হাতে পড়িয়া ইহা বিকৃত-প্রাপ্ত হওয়া ছিল স্বাভাবিক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পরকীয়াবাদ গৃহীত হইল এবং অঞ্চল বিশেষে গৌর-নাগরীভাবের সাধনার সার্থকতাও স্বীকৃত হইল। এই সব বিষয়ের পশ্চাতে যে দার্শনিক তত্ত্ব এবং সাত্ত্বিক ভাব আছে, সহজিয়াপন্থিগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের পথ পরিষ্কারের যেন একটা উপায় খুঁজিয়া পাইলেন।

পাল-যুগে খ্রীষ্টীয় ৮ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ-সহজিয়া সম্প্রদায়ের খুব প্রভাব দেখা যায়। এই বৌদ্ধ-সহজিয়ার দল পরে সেন রাজত্বের সময় গোপনে সমাজের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বা তুর্কী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় বা হিন্দু-

সমাজের বিরোধিতায় বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গমন করেন এবং অবশেষে নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেন রাজাদের সময় হইতেই বাঙলাদেশে রাধা-কৃষ্ণ-সম্বলিত বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটে। সহজিয়াগণের ধর্ম ছিল কতকগুলি গুহ্য সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেন রাজাদের সময়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের পরে এইসব গুহ্য-সাধনা বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গেও জড়িত হইয়া পড়ে এবং এই ভাবেই বৈষ্ণব সহজিয়া মত গড়িয়া উঠে।[১]

এই বৈষ্ণব সহজিয়াদেরই এক শাখা পরে "নেড়া-নেড়ী" নামে পরিচিত হন। ইঁহারা ছিলেন বর্ণাশ্রমধর্ম-বিরোধী ও মুণ্ডিত মস্তক। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষস্বরূপ নেড়া-নেড়ী নাম-ধারী এই সব নারী-পুরুষগণের মধ্যে ছিল অবাধ মেলা-মেশার ঝিড়িক এবং রিপুর নির্বাধ চর্যাই ছিল তাঁহাদের রহস্যময় সাধনানুষ্ঠানের উপায়।

কথিত আছে, নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) ১৭শ শতকের শেষের দিকে এই নেড়া-নেড়ীর দলকে দীক্ষা দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মে ঠাঁই দেন। ইহা সত্য হইলে বলিতে হয়, ইঁহারা তাঁহাদের পূর্বতন অভ্যাস একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

বীরভদ্র ছিলেন জাহ্নবা দেবীর স-পত্নী বসুধা দেবীর পুত্র। বিমাতা জাহ্নবা দেবী তাঁহার উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে বীরভদ্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার জীবনেতিহাস প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বৈষ্ণব সহজিয়াগণ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহা পড়িলে কতকগুলি গাল-গল্প ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ "বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা"[২] নামক একখানি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এখানি দরবেশদের

১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান (১ম খণ্ড), পৃঃ ১২৭
২ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত— বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, পৃঃ ৬২—৬৩

একখানি গ্রন্থ এবং ইহার গ্রন্থকাররূপে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম ছাপা হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, নিত্যানন্দ বীরভদ্রকে বলিতেছেন—

শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা সহরে।
যথায় আছেন বিবি হজরতের ঘরে॥
তথায় যাই শিক্ষা লহ মাধব বিবির সনে।
তাঁহার শরীরে প্রভু আছেন বর্ত্তমানে॥
মাধব বিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই।
তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই॥

ইহার পর গ্রন্থে লেখা হইয়াছে, বীরভদ্র মদিনায় গেলেন এবং সেখানে গিয়া মাধব বিবির[১] স্তব করিলেন। এখানে বক্তব্য এই যে, মধ্যযুগে একমাত্র নানক ব্যতীত কোন হিন্দু-ধর্ম-প্রচারক ভারতের বাহিরে গিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণও নাই, জনশ্রুতিও নাই। কাজেই এই শ্রেণীর বই পড়িলে সহজেই বুঝা যায় যে, ইহা আজগুবি ও অপ্রামাণিক গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে এবং একজন জাল কৃষ্ণদাস কবিরাজ খাড়া করিয়া তাঁহার দ্বারা এই গ্রন্থ প্রচার করা হইয়াছে।

নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রকে যে বৈষ্ণব-সমাজ অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তবে তাঁহার কিছু কিছু আচার-আচরণ হয়তো অনেকে পছন্দ করিতেন না। বিশেষতঃ "নেড়া-নেড়ী" সংক্রান্ত ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া রক্ষণশীল বৈষ্ণবগণের হয়তো কেহ কেহ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন।

১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য "মাধব বিবির কড়চা" নামক একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুঁথিতে মাধব বিবি বীরভদ্রের শিক্ষাগুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই পুস্তকের কে রচয়িতা, তাহা বুঝা যায় না। তবে একস্থানে কৃষ্ণদাসের উল্লেখ আছে। আমাদের মনে হয়, "বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা" ও "মাধব বিবির কড়চা" একই ধরনের পুথি। কৃষ্ণদাসের নামে এইসব পুস্তক প্রচারের চেষ্টা চলিয়াছিল। দ্রষ্টব্য বাংলার বাউল ও বাউল গান পৃঃ ৩৭৬

তবে এই সব ব্যাপার কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা শক্ত। হয়তো তাঁহার সম্বন্ধে কিছু গল্প-কাহিনী, কিছু দলাদলির বিবরণী, কিছু বা ধর্মান্তীকরণের বিবরণী বহু-পরিবর্তন ও অতিরঞ্জনের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি দুই বিবাহ করেন এবং নিজের শ্বশুর যদুনন্দনকে শিষ্য করেন। তাঁহার সময়ে খড়দহ-মন্দিরে যে নিয়মে পূজাদি নির্বাহ হইত এখনও ঠিক সেই নিয়মেই চলিয়া আসিতেছে। এখানকার মন্দিরে প্রত্যহ প্রথম পূজা পান ত্রিপুরা-সুন্দরী রক্ত-জবাফুল দ্বারা। ইহার পর তিব্বত হইতে আনাত নীলকণ্ঠদেবের পূজা হয়। পরে নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু-প্রদত্ত দণ্ড পূজা পান এবং রাধা শ্যামসুন্দরের ভোগরাগাদি হয়।[১]

ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী লিখিয়াছেন, খড়দহের "মন্দিরে নীলকণ্ঠ-শিবের মস্তকে অবস্থিত তাম্রফলকে ত্রিপুরা সুন্দরীর যন্ত্র স্থাপিত আছে। নরহরি সরকারঠাকুরের বংশে শ্রীখণ্ডে ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর পূজা হইতে। কবিরঞ্জনের পদে ত্রিপুরা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা :—

কহে কবিরঞ্জন ত্রিপুরা চরণে মন
অবধান কর তুহুঁ কান।

পদকল্পতরুতে একটি পদে দেখা যায়—

ত্রিপুরা চরণ কমল মধু-পান
সরস সঙ্গীত-কবিরঞ্জন ভান।

* * *

এই সব দেখিয়া মনে হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপর তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব কোথাও কোথাও কিছু পড়িয়া গিয়াছিল।"[২]

ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী এখানে "তান্ত্রিকধর্ম" অর্থে কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। তন্ত্রের

১ শ্রীশ্রীবীরভদ্র জয়তি (খড়দহের প্রাচীন ইতিহাস সম্বলিত স্মারকগ্রন্থ)—কুমারনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত (বঙ্গাব্দ ১৩৭৪) পৃঃ ৬

২ বাংলার বৈষ্ণবসমাজ, সংগীত ও সাহিত্য (১৯৬৮), পৃঃ ৩৯-৪০

সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সম্বন্ধ তো আছেই। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে ত্রিপুরাসুন্দরীর সম্পর্ক দেখিয়া এই ধর্মের উপর "তান্ত্রিকধর্মের প্রভাব কোথাও কোথাও কিছু পড়িয়া গিয়াছিল" বলিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। কেননা ত্রিপুরাসুন্দরীর সঙ্গে আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় সম্পর্ক। তাই বলিয়া খড়দহ-মন্দিরে ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা হয় দেখিয়া নিত্যানন্দ বা বীরভদ্র এই সেবা প্রবর্তন করিয়াছেন—এমন কথাও আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। খড়দহে নিত্যানন্দ আসিবার পূর্বে সেখানে পুরন্দর পণ্ডিতের বাস ছিল। নিত্যানন্দ খড়দহে আসিয়া প্রথমে পুরন্দর পণ্ডিতের আবাসস্থানেই অবস্থান করিতেন। তাই চৈতন্য-ভগবতে দেখা যায়—

তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে ॥[১]

ভক্তিরত্নাকরেও আছে –

খড়দহে আসি প্রভু নিজগণসঙ্গে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে রহে ॥[২]

এই পুরন্দর পণ্ডিতের আশ্রম খড়দহে বর্তমান নাতুপাল ঘাটের উত্তরে অবস্থিত ছিল বলিয়া লোকপরম্পরায় শোনা যায়। আরও শোনা যায়, তিনি ত্রিপুরাসুন্দরীর সেবা করিতেন এবং সেই সেবা-ভার তিনি নিত্যানন্দের উপর অর্পণ করেন এবং সেই হইতে খড়দহ মন্দিরে ত্রিপুরাসুন্দরী পূজা পাইয়া আসিতেছেন। আবার ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী বলেন,[৩] "শ্রীনিত্যানন্দের উর্দ্ধ ২০পর্য্যায়ে চন্দ্রকেতু ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঘোরতর তান্ত্রিক থাকিলেও চন্দ্রকেতু পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী চন্দ্রকেতুর পিতার প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দ আনয়ন করেন।"

১ অন্ত্য, ৫ম অঃ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত (বঙ্গাব্দ ১৩৬৯ পৃঃ ৪৪৬
২ ১২শ তরঙ্গ, শ্লো ২৭০২, গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০), পৃঃ ৬০০
৩ শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশবল্লী, উত্তর বিভাগ (বঙ্গাব্দ ১৩২১), পৃঃ ৭৮

এ সব তথ্যের কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা নির্ণয়ের অবকাশ এখানে নাই। এখন দেখা যাউক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সহিত ত্রিপুরাসুন্দরীর কিরূপ সম্পর্ক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণযুগলেরই উপাসক। ত্রিপুরাসুন্দরীর রহস্যে পূর্ণ অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তবেই রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারা যায়। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণযামল মহাতন্ত্র হইতে এই তত্ত্বটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণযামল মহাতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উর্দ্ধ-লোকের অন্তর্গত স্বর্গ, মহর্লোক, জনলোক তপোলোক, ও সত্যলোক সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মলোকের উপর চতুর্ব্যূহের স্থান।…চতুর্ব্যূহের উর্দ্ধে ও উত্তরে জ্যোতির্ম্ময় বৈকুণ্ঠধাম বা পরব্যোম।… ইঁহার উপরে কৌমারলোক …। ইহার উপর মহাবিষ্ণুর স্থান। ইহার উপর ত্রিপুরাসুন্দরীর লোক ইঁহার পূর্ণযন্ত্র, যাহা শ্রীযন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ, এই স্থানে বিরাজমান। ইনি কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপা, চতুর্ভুজা এবং রক্তবর্ণা। ইনি শুক্লবর্ণা বাণী, পীতবর্ণা ভুবনেশ্বরী, রক্তবর্ণা ত্রিপুরাসুন্দরী, শ্যামবর্ণা কালিকা এবং কৃষ্ণবর্ণা নীল সরস্বতী।"[১]

এই ত্রিপুরাসুন্দরীই ললিতা নামে মুখ্যসখীরূপে বৃন্দাবনলীলায় স্থান পাইয়াছেন এবং "বাসুদেব রহস্য" নামক গ্রন্থে আছে।

হরিনাম্নোহ মন্ত্রস্য বাসুদেবঋষিঃ স্মৃতঃ।
গায়ত্রীছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতা মতা॥[২]

অর্থাৎ হরিনামরূপ মহামন্ত্রের ঋষি বাসুদেব, ছন্দ গায়ত্রী এবং দেবতা স্বয়ং ত্রিপুরা।

কাজেই নরহরি সরকার, কবিরঞ্জন প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের যুগল-তত্ত্বের রহস্য অবগত ছিলেন বলিয়াই শ্রীখণ্ডে ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা হইত এবং কবিরঞ্জনও ত্রিপুরাসুন্দরীর গুণগান করিয়াছেন।

---

১ শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ (১৯৭), পৃঃ ২৭৫-৭৬

২ শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৭৩-৭৪

বীরভদ্রও ছিলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি বৌদ্ধাবলম্বী ভিক্ষুক, যাঁহাদের হিন্দুসমাজে কোন ঠাঁই ছিল না, তাঁহাদের বৈষ্ণব-সমাজে টানিয়া লইয়া নিয়মাবদ্ধ ও সংযত করিতে প্রয়াস পান। কথিত আছে, ইঁহারা সংখ্যায় ছিলেন বার শত। বীরভদ্র ইঁহাদের জন্য তেরো শত নেড়ীও ঠিক করিয়াছিলেন,—

বার শত নাঢ়া আর তেরশত নেঢ়ি।
কেহো বহে গঙ্গাজল কেহো শোধে বাড়ি॥
বীর ২ করি নাঢ়া করে সিংহনাদে।
কারো নাহি ভয় বীরচন্দ্রের প্রসাদে।
হেন লীলা বীরচন্দ্রের ইচ্ছাতে হৈল।
নাঢ়ি সৃষ্টি করি নাঢ়ার তেজঃক্ষয় কৈল॥[১]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও বলেন, নিম্নশ্রেণীর এক অংশ সমাজ-চ্যুত হইয়া যাঁহারা মুসলমান হইলেন না, অথচ বৌদ্ধ-সাধনাকে মূলতঃ বজায় রাখিয়াই বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয়ে আসিলেন, তাঁহারাই 'নেড়া-নেড়ী' নামে অভিহিত হন।[২] নিত্যানন্দ-বীরভদ্র-প্রভাবিত খড়দহ-গোষ্ঠী বর্ণাশ্রমধর্মবহির্ভূত এই সম্প্রদায়কে যে পরমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহাও সত্য যে, পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও দয়াল বীরভদ্রের উদার মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও এই জন-গোষ্ঠী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আশ্রয় পাওয়ার ফলে পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব-সমাজের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়ে।

পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, এই নেড়া-নেড়ীর দল বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে বেশ জমকাইয়া বসিয়াছেন এবং পূর্বে বৈষ্ণব-সহজিয়ার যে ক্ষীণ ধারা বাঙলাদেশে প্রবাহিত ছিল, তাহার সহিত যেন মিশিয়া

---

১ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর—নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার, ৩য় স্তবক (নবদ্বীপচন্দ্র বিস্তারত্ন গোস্বামি-ভট্টাচার্য দ্বারা পরিশোধিত, শকাব্দ ১৭৯৬), পৃঃ ২৩

২ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচর্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান, (প্রথম খণ্ড) পৃঃ ২৫১

যাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। সম্ভবতঃ এই ভাবেই চৈতন্যোত্তর যুগে নব-উদ্যমে বৈষ্ণব সহজিয়ার উপ-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে।

ইহার কারণ হইল, বৈষ্ণব সহজিয়াগণ মনে করিলেন, তাঁহাদের আচরিত ধর্মের সহিত চৈতন্য-ধর্মের বেশ মিল। বৈষ্ণবদের রাধা-কৃষ্ণ-বাদ অনেকটা তাঁহাদের প্রকৃতি-পুরুষবাদের মতো। বিশেষতঃ কৃষ্ণ প্রেমের "বিষয়", রাধিকা "আশ্রয়", 'নিরন্তর কাম-ক্রীড়া যাহার চরিত'[১] প্রভৃতি বর্ণনার সঙ্গে তাঁহাদের ভাব-ধারার বেশ সামঞ্জস্য আছে। কাজেই তাঁহারা বুঝিলেন, গোস্বামিগণও সহজ সাধনা করিতেন এবং চৈতন্যদেবেরও ইহাই ছিল সাধনার ধারা।[২] কাজেই সহজিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমকে তাঁহাদের ধর্ম-সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া "নায়িকা ভজনের" বিধি সংস্থাপন করিলেন। ইহার তাৎপর্য হইল "রাধা-ভজন"। ইহারই নাম "আরোপ সাধনা"। ইহাতে নারী গ্রহণের যে নিয়ম রহিয়াছে, তাহাতে পরকীয়ারই প্রাধান্য।[৩] পরিণামে ইহার ফল ভাল হইল না। কেননা প্রাকৃত দেহ লইয়া যেখানে প্রধান কারবার, সেখানে ধর্ম-কর্ম শেষ পর্যন্ত নির্জলা রিপুর অনুশীলনেই পর্যবসিত হয়। হইলও তাহাই। এইজন্য দেখা যায়, বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রেম-সাধনা "আরোপ তত্ত্বের" পথ ধরিয়া শেষ পর্যন্ত কাম-ক্রীড়ার পাপপঙ্কেই নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, আউল, বাউল, কর্তাভজা, দরবেশ, সাঁই, চূড়াধারী, জাত-গোসাই প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। এগুলি সহজিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও সহজিয়াদের কিছু প্রভাব এই সব সম্প্রদায়েরও উপর ছিল বলিয়া মনে হয়। কেন না ইহাদের দেহ-ঘটিত-সাধনার সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবের প্রেম-তত্ত্বের দিক দিয়া কিছু সাদৃশ্য আছে। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে বলা হইল—

১ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

২ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান (১ম খণ্ড), পৃঃ ২৮৮

৩ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ, পৃঃ ২৩৩, ২৬০

আউল

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে বর্তমানে বাউল-সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণীর মুসলমান সাধককে আউল বা আউলিয়া বলা হয়।[১] অদ্বৈতাচার্যের প্রহেলিকার মধ্যেও 'আউল' শব্দটি আছে। ইহা "আকুল"-শব্দেরই-প্রাকৃতরূপ বলিয়া অনেকে মনে করেন।

আউলদের গুরু আউলিয়া নামে খ্যাত। তাঁহাদের নিকট হইতে যাঁহারা দীক্ষা লইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সব আউলিয়াদের শিষ্য বলিয়া-নিজেদেরও 'আউল' বা 'আউলিয়া' বলিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে আউলিয়াদের কয়েকটি গুরু-পীঠ আছে। এই গুরু-পীঠকে 'গদি' বা 'ঘর' বলে। আউলদের সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে বাউলদের সাধন-পদ্ধতির অনেক মিল আছে।[২]

বাউল

এই ধর্মের সাধন-প্রণালী-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। "তাহার উপর শিব-শক্তিবাদ, রাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণব-সহজিয়াতত্ত্ব, সুফী-দর্শন ও তত্ত্ব, গৌড়ীয় ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব পড়িয়াছে এবং ইহার সঙ্গে কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ইহা একটি বিশিষ্ট ধর্মরূপে গঠিত হইয়াছে।" কাজেই ইহাকে একটি সমন্বয়মূলক ধর্ম বলা চলে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাঙলাদেশে ধর্মের ক্রম-পরিণতিতে বাউল-ধর্মের স্থান এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন[৩]—

---

১ বাংলার বাউল ও বাউল গান, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৭।

২ ঐ, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৬৯

৩ ঐ, (১ম খণ্ড) পৃঃ ২৯০
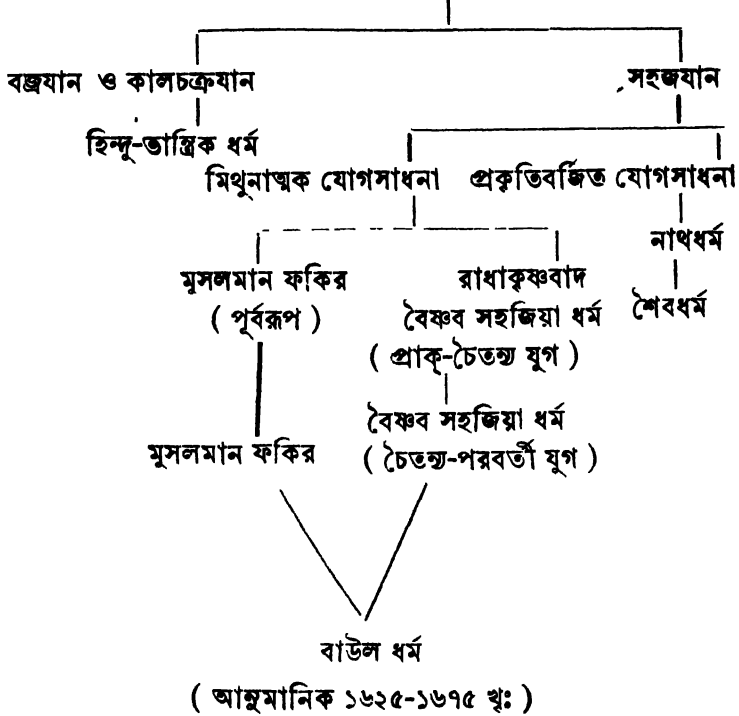
'বাউল'-শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃতরূপ 'বাউল', কাহারও মতে 'বাউল' শব্দটি-'বায়ু' শব্দের সহিত 'আছে' এই অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন, আবার কেহ বলেন, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থ জীবন-ধারণ এবং তাহা সংরোধ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভের সাধন যাঁহারা করেন, তাঁহারাই বাউল।

এই সব বিভিন্ন মতের মধ্যে 'বাতুল' অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 'বাতুল' মানে পাগল। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন,—"সাধারণের জীবনযাত্রার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পাগল বা ক্ষেপা বলে।"[১] এইরূপ উক্তি-সঙ্গত নহে বলিয়াই

১ বাংলার বাউল ও বাউল গান, (১ম খণ্ড) পৃঃ ৪৭

আমাদের ধারণা। অবিভক্ত বাঙলার নদীয়া জিলার অধীন কুষ্টিয়া মহকুমার (এখন পাকিস্তানে) ভেড়ামারা, চণ্ডীপুর, বামনপাড়া, কোদালিয়াপাড়া প্রভৃতি পল্লী অঞ্চলে এক সময়ে বেশ কিছু বাউলের বাস ছিল। ইঁহাদের পদবী ছিল 'ক্ষেপা'। সাধারণের জীবনযাত্রার সহিত তাঁহাদের জীবন-যাত্রার মিল ছিল না সত্য, তবে লোকে তাঁহাদিগকে কোনদিনই পাগল বলিয়া মনে করে নাই, বরং সম্ভ্রমের চক্ষেই দেখিয়াছে।

চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখা যায়, জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফতে অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুকে যে প্রহেলিকাপূর্ণ বার্তাটি[১] পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে 'বাউল' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ফলে অনেকে অদ্বৈতাচার্যকে বাউল-সম্প্রদায়ের আচার্য বা আদিগুরু বলিয়া ধারণা করেন। বিশেষতঃ বাউলগণও অদ্বৈচার্যের এই প্রহেলিকাটিকে নিজেদের সম্প্রদায়ের অনুকুল অর্থেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।[২] এই মতবাদ কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে গোড়ায় গোস্বামিগণ অদ্বৈতাচার্যের বার্তাটির কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা দেখিতে হইবে। প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী[৩] প্রহেলিকাটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ হইতেছে— মহাভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুকে বলিও যে, সবলোক প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ-প্রেমলাভ করে নাই এমন লোক এখন আর নাই। কাজেই

---

১ বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল ॥ ১৯ ॥
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ ২০ ॥
—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা—১৯শ অধ্যায়
(রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত গ্রন্থ)

২ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাংলার বাউল ও বাউলের গান—(১ম খণ্ড) পৃঃ ৪০

৩ চৈতন্য চরিতামৃত, পৃঃ ৮৩৬

তিনি যে-সব ভাব-বিকার প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার আর প্রয়োজন নাই। রাধাগোবিন্দনাথও অনুরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।[১] তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'বাউল' শব্দটি সাধারণভাবে ভাবোন্মত্ত বা প্রেমোন্মত্ত অর্থেই গৃহীত হইয়াছে, 'বাউল' নামে যে স্বতন্ত্র ধর্ম-সম্প্রদায় অর্থাৎ বৌদ্ধ-সহজিয়া ও বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদের তত্ত্ব বা দর্শন যে বাউলের' দার্শনিক ভিত্তিভূমি, তাহার সহিত ইহার কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই।

বাউলদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান—দুই জাতির লোকই আছেন। মুসলমান জাতির এই সব সাধককে বলা হয় ফকির। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, সাধারণ ফকিরদের সহিত প্রভেদ-জ্ঞাপনের জন্য ইহাদিগকে বলা হয় "নেড়ার ফকির" এবং দুই-এক স্থানে ইহাদিগকে 'বে-শরা' ফকির 'মারফতী' বা 'বেদাতী' ফকিরও বলা হইয়া থাকে।

কর্তাভজা

অষ্টাদশ শতকে কলিকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের সাধকগোষ্ঠী বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠেন।[২] ইঁহারা স্বতন্ত্র এক ধর্ম-সম্প্রদায় হইলেও বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে ইঁহাদের কিছু সম্পর্ক আছে। বিশেষতঃ প্রবাদ এই যে, এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদই পুরীধামে অন্তর্হিত শ্রীচৈতন্য।[৩]

এই সম্প্রদায়ের 'কর্তাভজন ধর্মের আদি বৃত্তান্ত বা সহজতত্ত্ব প্রকাশ' নামে একখানি বই আছে। ইহা পাঠে জানা যায়, এই ধর্মের আদি-প্রবর্তক ফকির ঠাকুর বা ফকির আউলচাঁদ, কর্তাবাবা

---

১ চৈতন্যচরিতামৃত—পৃঃ ৬৫২-৫৩

২ ডক্টর সুকুমার সেন—"কর্তাভজার কথা ও গান" (প্রবন্ধ)—বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ এবং ভারতকোষ, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা-২য় খণ্ড (অশোক মিত্র সম্পাদিত), পৃঃ ৩৫৪

বা আদিগুরু রামশরণ পাল এবং আদি-প্রচারক তাঁহার পুত্র দুলাল-চাঁদ। এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত আছে। সচরাচর প্রচলিত কাহিনীটিই এখানে বলা হইতেছে।

নদীয়া জিলার উলা গ্রামের মহাদেব বারুই তাঁহার পান-বরোজের মধ্যে একবার এক শিশুকে কুড়াইয়া পান। শিশুটিকে তিনি বাড়ী লইয়া গিয়া লালন-পালন করেন। ইঁহারই নাম আউলচাঁদ। আউলচাঁদ বড় হইয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং চব্বিশ পরগণা ও সুন্দরবন অঞ্চলের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম-ভাবের স্ফুরণ হয়। তিনি যখন বেজরা গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই তিনি ধর্ম-গুরুরূপে প্রথম প্রকট হন। এই সময় তাঁহার বয়স সাতাশ। তখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেকেই ইঁহার অনুরাগী হইয়া পড়েন এবং বাইশজন ভক্ত ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'কর্ত্তাভজন ধর্মের আদি-বৃত্তান্ত বা সহজতত্ত্ব প্রকাশ' নামক গ্রন্থে এই বাইশজন শিষ্যের বিবরণ এইরূপ লেখা আছে :

শুন সবে ভক্তিভাবে নামমালা কথা।
বাইশ ফকিরের নাম ছন্দেতে গাঁথা॥
জগদীশপুরবাসী বেচু ঘোষ নাম।
শিশুরাম কানাই নিতাই নিধিরাম॥
ছোট ভীম রায় বড় রমানাথ দাস।
দেদো কৃষ্ণ গোদা কৃষ্ণ মনোহর দাস॥
খেলারাম ভোলানাড়া কিনু ব্রহ্মহরি।
আন্দিরাম নিত্যানন্দ বিশু পাঁচকড়ি॥
হটু ঘোষ গোবিন্দ নয়ান লক্ষ্মীকান্ত।
ইহারাই ভক্তিপ্রেমে অতিশয় শান্ত॥
পূর্ব্বের অনুসঙ্গী এই বাইশ জন।
এরাই করিল আসি হাটের পত্তন॥[১]

১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান (পৃঃ ৬৪) হইতে উদ্ধৃত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আউলচাঁদের এই বাইশজন শিষ্য হইতেই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ। আউলচাঁদের ১৬১৬ শকাব্দে (১৬৯৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে) আবির্ভাব এবং ১৬৯১ শকাব্দে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে) ৭৫ বৎসর বয়সে তিরোভাব।

আউলচাঁদের তিরোভাবের পর দলের ভাঙন আরম্ভ হয়। তখন আউলচাঁদের অন্যতম শিষ্য রামশরণ পালের (রমানাথ) নেতৃত্বে আবার সকলে সমবেত হন। রামশরণের নিবাস ছিল নদীয়া জিলার চাকদহ থানার অধীন ঘোষপাড়া গ্রামে। তখন হইতে রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু-পদে বৃত হন। রামশরণের পর তাঁহার স্থান অধিকার করেন তৎপুত্র দুলালচাঁদ। পূর্বেই বলিয়াছি দুলালচাঁদই এই ধর্মের আদি-প্রচারক। ভক্তগণের বিশ্বাস, আউলচাঁদই রামশরণের পুত্র দুলালচাঁদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামশরণ পালের সহধর্মিণী কর্তাভজাদের কাছে "সতীমা" নামে খ্যাত। তাঁহাদের ধারণা, সতীমা পরমা প্রকৃতি যোগমায়া।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারেও কর্তাভজাদের প্রভাব দেখা যায়। ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন, খিদিরপুরের (ও কাশীর) মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল রামশরণ পালের শিষ্য ও অনুরাগী ছিলেন।[১]

এখনও ঘোষপাড়ায় রামশরণ পালের বাড়ীতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর এখানে সতী-মা'র দোলমহোৎসব, ভক্তসম্মেলন ও বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হয়। বীরভূম জিলার কেন্দুলীতে অনুষ্ঠিত বাউল সম্প্রদায়ের মেলা যেরূপ বিখ্যাত, ঘোষপাড়ায় অনুষ্ঠিত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মেলাও সেইরূপ বিখ্যাত।

এই সম্প্রদায়ের সাধনার ক্ষেত্রে জাতি-বিচার নাই। বাউলদের মতো অধ্যাত্ম সংগীতই ইঁহাদের সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ।

১ ভারত-কোষ, ২য় খণ্ড—(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

সাঁই

'সাঁই'-শব্দটি 'স্বামী'-শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। বাউল-সংগীতের অনেক স্থানে 'সাঁই' কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়—যেমন, লালনের একটি গানে আছে—

বেদে কি তার মর্ম্ম জানে।
যেরূপ সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে॥

এখানে ভগবানকে 'সাঁই' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাউলরা গুরুকেই সকলের উপর ঠাঁই দিয়াছেন। এই জন্য তাহাদের কাছে গুরু ভগবানের স্বরূপ. যেমন—লালনের গুরু সিরাজ সাঁই। কাজেই, 'সাঁই'-পদবীধারী সাধকগণকে বাউল সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দরবেশ

দরবেশগণ সনাতন গোস্বামীকে তাঁহাদের আদি পুরুষ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। কেননা সনাতন গোস্বামী রক্ষকের হাত হইতে ছাড়া পাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, তিনি গৌড় অঞ্চলেই আর থাকিবেন না, দরবেশ হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইবেন—"দরবেশ হইয়া আমি মক্কাতে যাইব"।[১] মিঃ কেনেডিও[২] এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মত কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সনাতন গোস্বামী ছাড়া পাইবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন মাত্র। ছদ্মবেশ ধারণ করার অর্থ হইল কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা। এই ভাবে একটা মতবাদের কোথাও উদ্ভব হইতে দেখা যায় না। বিশেষতঃ সনাতন গোস্বামীর পরবর্তী কার্যধারার সহিত দরবেশদের কার্যধারার কোথাও সংশ্রব নাই। কাজেই দরবেশগণের মত এখানে অচল।

---

১ চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য-লীলা

২ The Chaitanya Movement.

লালন ফকিরের একটি গানে আছে—

দরবেশ লালন শা' কয়,
তরিক এই হয়,—
বন্দেগি হাল্লাজের তরে।[১]

এখানে দেখা যায়, লালন নিজেকে দরবেশ বলিতেছেন। ইহাতে মনে হয়, বাউলপন্থী মুসলমান ফকিরদের মধ্যে যাঁহারা গুরুস্থানীয় তাঁহারাই দরবেশ।

চূড়াধারী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রয়াস পান। ইঁহাদের মধ্যে বাসুদেব শিয়াল, বিষ্ণুদাস কপীন্দ্র প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। চৈতন্যভগবত, প্রেমবিলাস, প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহাদের বিবরণ আছে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান বাসুদেব ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব। অন্যায় আচরণের জন্য তিনি বৈষ্ণব-সমাজ হইতে বিতাড়িত হন—

বাসুদেব নামে বিপ্র বড় দুরাচার।
রাঢ়দেশে করে পাপী বড় অনাচার॥
বলে "আমি ঈশ্বর, নন্দের দুলাল।"
শুনি সব লোক তারে বোলয়ে শিয়াল॥
এই মহাপাপী হইল মহাপ্রভুর ত্যাজ্য।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ্য॥

—প্রেমবিলাস, ২৪ বিলাস

এই বাসুদেব শিয়ালের এক শিষ্যের নাম মাধব চূড়াধারী। ইনিও ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং অপকর্মের জন্য বৈষ্ণব-সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হন—

মাধব-নামে বিপ্র কোন রাজার পূজারী।
শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার নিল চুরি করি॥

---

১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৫৩

কোনস্থানে গোপের পল্লীতে চলি গেল ।
গোয়ালার পৌরোহিত্য করিতে লাগিল ॥
কামুক পাপিষ্ঠ তথি কাচি' চূড়াধারী ।
আপনারে গাওয়ায় 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' করি ॥
বলে—"আমি চূড়াধারী কৃষ্ণ নারায়ণ ।
আমারে ভজিলে পাবে বৈকুণ্ঠ ভবন ॥"

—প্রেমবিলাস, ২৪ বিলাস

বৃন্দাবনে চূড়াধারীদের কুঞ্জ আছে।[১] বৈষ্ণব-সমাজ হইতে তাঁহারা পৃথক।

জাত গোঁসাই

মিঃ রিজ্‌লে জাত গোঁসাইকে একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।[২] স্মৃতি নির্দিষ্ট কোন জাতির মধ্যে ইঁহারা পড়েন না, হিন্দুর আচার-নিয়মও ইঁহারা মানেন না। ইঁহারা গৃহী, অথচ অপরাপর গৃহী-বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ যে সব নিয়ম মানিয়া চলেন, তাহা ইঁহারা পালন করেন না। এই জন্য হিন্দু-জাতির সকল সম্প্রদায় হইতে ইঁহারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের সমাজে বিবাহ ও বিধবা বিবাহের চল আছে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদও ইঁহারা সমর্থন করেন। তবে স্মৃতির মন্ত্র পড়িয়া ইঁহাদের বর-কনেগণ কোন দিনই বিবাহ-বাসরে মিলিত হন না। হিন্দু সমাজের সকলেরই যেমন একটা 'গোত্র' আছে, ইঁহাদের তাহা নাই। তবে ইঁহারা "অচ্যুত-গোত্র" সম্ভূত এবং এই গোত্র কৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইঁহারা দাবী করেন।

এই সমাজের গুরুদিগকে সাধারণতঃ "অধিকারী" বলা হয়। এই অধিকারীদেরও অনেকে পূর্বে নিম্নবর্ণের লোক ছিলেন, ক্রমে

---

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, পৃঃ ১৫২

২ Tribes and Castes of Bengal.

উচ্চবর্ণের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরে উচ্চবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

মৃত ব্যক্তিকে ইঁহারা সমাধিস্থ করেন এবং অপরাপর হিন্দুর ন্যায় মৃতের পারলৌকিক কৃত্যের অনুষ্ঠান কিছু করেন না।

সখী

কথিত আছে সখীভাবের উপাসনা চরণদাস[১]-কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এই চরণ দাস আলমগীর (২য়)-এর রাজত্বকালে (১৭৫৪-১৭৫৯খ্রীঃ) দিল্লীতে বাস করিতেন।

অনেক সময় দেখা যায়, পুরুষ নারী-বেশ ধারণ করিয়া সখীভাবে সাধনা করিতেছেন। অবশ্য সাধক ভক্তের সাধ্য হইতেছে আপন সখী ও তদনুগতা মঞ্জুরীর আনুগত্য স্বীকারে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজন-সাধন। এজন্য পুরুষ-সাধককে নারীবেশ ধারণ করিতে হইবে, এমন কোন বিধি নাই।

ডক্টর আর, জি ভাণ্ডারকর মনে করেন,—"The worship of Radha, more prominently even than that of Krṣṇa, has given rise to a sect, the members of which assume the garb of women with all their ordinary manners · ..."[২]

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের এবং তদনুগত শ্রীনিবাস-নরোত্তম প্রভৃতির গ্রন্থে কোথায়ও নাই যে, পুরুষ-সাধক নারীবেশ ধারণে সাধনা করিতেছেন।

কাজেই কোনও কোনও পুরুষ-ভক্ত নারীবেশ ধারণ করিয়া সাধনা করিতেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার পূজা প্রবর্তন ও রাধাকে প্রাধান্য দানের জন্যই যে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ডক্টর ভাণ্ডারকর কোথা হইতে পাইলেন? বিশেষতঃ রাধা-

১ H. H. Wilson—Religious Sects of the Hindus, p. 178
২ Vaisnavism, Saivism an Minor Religious Systems, p. 86

কৃষ্ণের যুগল-উপাসনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শাস্ত্রসম্মত। কাজেই রাধাকে বাদ দিলে বৈষ্ণবতত্ত্বই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ডক্টর ভাণ্ডারকরের এরূপ উক্তি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা ছাড়া কোন উপায় নাই।

স্মার্ত

যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত কর্ম-কাণ্ডের অনুশীলনে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় নির্ধারণ করেন, তাঁহারাই স্মার্ত। ধর্ম-শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে; কিন্তু তাহার সহিত জ্ঞান ও ভক্তির মিলন থাকা চাই। জ্ঞান ও ভক্তিহীন শুধু শুষ্ক কর্মের দ্বারা রাধা-মাধবের কৃপা লাভ করা যায় না। এই সিদ্ধান্ত অধ্যাত্ম-শাস্ত্রসমূহে নির্ধারিত হইয়াছে। শ্রুতিতে তাই দেখা যায়—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঃ।

এই ত্রি-তাপ-সঙ্কুল ভবসাগরের পারে যাইবার জন্য যজ্ঞ বা বিহিত কর্মরূপ যে প্লব (ভেলা) তাহা দৃঢ় নহে।

অতিবড়ী

উৎকল হইতে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এই সম্প্রদায়ের সাধকগণ ডোর-কৌপীন ধারণ করেন, নাসাগ্র হইতে কেশের নিকট পর্যন্ত ঊর্ধ্ব পুণ্ড্র করিয়া থাকেন এবং নানা বর্ণের জাতির মধ্যে দীক্ষা দান করেন।[১]

পুরী জিলার অন্তর্গত কাপিলেশ্বরপুরের ভগবান পাণ্ডার পুত্র জগন্নাথ দাস এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। নবাক্ষর ছন্দের ইনি ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাহা এখনও উৎকলে সপ্তাহ পারায়ণাদি হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব বিরোধী অনেক কথা আছে। কথিত আছে, ইহা লইয়া মহাপ্রভুর

১ অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ভাগ), ১৮৭০, কলিকাতা

২ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭

সঙ্গে জগন্নাথ দাসের মতানৈক্য হয়। মহাপ্রভু জগন্নাথ দাসকে বলেন—"তুমি মুনি-ঋষির উপর কলম ধরিয়াছ, তুমি তাঁহাদের অপেক্ষাও বড়।"

সেই সময় হইতে সকলেই জগন্নাথ দাসকে "অতিবড়ী" আখ্যায় ভূষিত করেন এবং জগন্নাথের শিষ্যগণও "অতিবড়ী সম্প্রদায়" নামে খ্যাত হন।

পঞ্চসখা সম্প্রদায়

মহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িককালে উৎকলে 'পঞ্চসখা' সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ইঁহাদের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ হইলেন "শূন্য-মূর্তি", "শূন্য পুরুষ"। ইঁহাদের সাধন পদ্ধতিতে নাথ সম্প্রদায়ের সাধনার অনুরূপ কায়া-সাধনের বিধি আরোপিত হইয়াছে।[১]

উপরে যে সব উপ-সম্প্রদায়ের কথা বলা হইল, তাহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতানৈক্য ছিল। বিশেষতঃ অনেক সময় নানা রকম গর্হিত কার্যের জন্যও শিষ্ট সমাজের এই সব উপ-সম্প্রদায়ের উপর সহানুভূতি ছিল না। সিদ্ধ তোতারাম বাবাজীও এইসব উপ-সম্প্রদায়ের কার্য-কলাপ দর্শনে মনে আঘাত পান। দ্রাবিড়দেশীয় তোতারাম বাবাজী ছিলেন পরম পণ্ডিত এবং আদর্শ-বৈষ্ণব। ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি নবদ্বীপে আসেন এবং পরে ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। কথিত আছে, বৃন্দাবন-অবস্থানকালে মহাপ্রভুর নিত্য সেবার বিশৃঙ্খলা হইতেছে বলিয়া তিনি এক স্বপ্নাদেশ পান। তদনুসারে তিনি পুনরায় নবদ্বীপে আসেন এবং দশ-অশ্বত্থ-তলায় আসন করেন। তাঁহার সেবিত গিরিধারীও তাঁহার সঙ্গেই ছিল। পরে কৃষ্ণনগরের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ঠাকুরের আশ্রমের জন্য ঐ গাছতলায় ছয় বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। ইহা হইতে নবদ্বীপের বড় আখড়ার পত্তন। ঐ স্থান এখন

১ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, (প্রথম প্রকাশ) পৃঃ ২৮৫

গঙ্গা-গর্ভে। যাহা হউক, উপ-সম্প্রদায়সমূহের আচার-ব্যবহারে তিক্ত হইয়া সিদ্ধ তোতারাম বাবাজী বড় দুঃখেই একদিন বলিয়াছিলেন—

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই॥
অতিবড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে,—এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি॥"[১]

তোতারাম বাবাজীর প্র-শিষ্য লছমন দাস বাবাজী নবদ্বীপে পুরাণগঞ্জে রাধাকলুব পোতায় শ্রীবাস অঙ্গন স্থাপন করেন। ঐ স্থান গঙ্গা-গর্ভে বিলীন হইলে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে (= ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ) বর্তমান শ্রীবাস-অঙ্গন স্থাপন করেন লছমন দাসের প্র-শিষ্য হরিদাস বাবাজী। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শ্রীবাস-অঙ্গন গঙ্গা-গর্ভে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তোতারাম বাবাজীর প্র-শিষ্যের প্র-শিষ্য হরিদাস বাবাজী কর্তৃক শ্রীবাস অঙ্গন পুনর্নির্মিত হয়। তাহা হইলে বলিতে হইবে ইহারও প্রায় শতাবধি বৎসর পূর্বে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তোতারাম বাবাজী নবদ্বীপে আসেন এবং তখনও এইসব উপ-সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। পূর্বেই বলিযাছি, তোতারাম বাবাজী যখন দ্বিতীয়বার নবদ্বীপে আসেন তখন কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১০-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।[৩] কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই তোতারাম বাবাজী দ্বিতীয়বার নবদ্বীপে আসেন বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ নহে। ইহা ছাড়াও অনেক উপ-সম্প্রদায় আছে[৪]—

১ গৌড়ীয় কণ্ঠহার, ত্রয়োদশ রত্ন (শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত) পৃঃ ২২১

২ হরিদাস দাস—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১৮৯৬

৩ জ্ঞান ভারতী (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)

৪ গৌড়ীয় পত্রিকা (রবিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪, ইং ১৫।১২।৫৭)

(১) কিশোরীভজা, (২) ভজন খাজা, কত বলি হায় !
(৩) গুরুভোগী, (৪) গুরুত্যাগী, আরও যে বাহিরায় ॥
(৫) অসীমাত্যজা প্রণতি-মজা, আর বাসুদেবী খল।
(৬) দারী-সন্ন্যাসী (৭) শিষ্যা-বিলাসী, (৮) গুরু-প্রসাদী দল
(৯) উপনয়নত্যজা, (১০) পরমহংস সাজা, (১১) সঙ্করবর্ণ যত।
(১২) অসৎ-সঙ্গ, (১৩) দ্বিপাদ-ভঙ্গ, (১৪) সেবাপরাধী তত ॥
(১৫) রামদাস, (১৬) হরিদাস, (১৭) হরিবোলিয়া মত।
(১৮) নিতাই-রাধা গৌর-শ্যাম, বর্ণিব বা কত ॥
(১৯) সীতারামিয়া, (২০) রাধাশ্যামিয়া, (২১) শাউড়ীর দল আর।
(২২) ঘরপাগলা, (২৩) গৃহীবাউলা, সব চিনে উঠা ভার ॥
(২৪) বর্ণ বিরাগী, (২৫) আশ্রম-রোধী, (২৬) গৈরিক-বিরোধী যণ্ড।
(২৭) ধামাপরাধী, (২৮) নামাপরাধী, (২৯) বৈষ্ণবাপরাধী ভণ্ড ॥
(৩০) অদ্বয়বাদী মধ্ব-বিরোধী, এসব পাষণ্ড।
(৩১) কানুপ্রিয়া, (৩২) নাথ-ভায়া, অকাল কুষ্মাণ্ড ॥
(৩৩) গৌড়েশ্বর, (৩৪) বংশীধর, (৩৫) উলই-চণ্ডীবাদ।
(৩৬) স্মরণপন্থী-অধোমন্থী, (৩৭) যুগল-ভজন সাধ ॥
(৩৮) দাদা ও মা, (৩৯) ক্ষেপা বামা, আর যত অপসম্প্রদায়।
দেশ-বিদেশে, সাধুর বেশে ঘুরছে ফিরছে হায় ॥
পূর্ব্বকালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়।
তিন-তেরো বাড়্‌ল এবে ধর্ম্ম রাখা দায় ॥

ইহা হইতে দেখা যায়, সিদ্ধ তোতারাম বাবাজী-বর্ণিত ১৩টি উপ-সম্প্রদায়ের সহিত আরও ৩৯টি আসিয়া যুক্ত হইয়া মোট ৫২টি উপ-সম্প্রদায়ে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাই যে উপ-সম্প্রদায়গুলির সর্বমোট সংখ্যা তাহাও সঠিকভাবে বলা যায় না। এমন অনেক উপ-সম্প্রদায় আছে, যাহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ এইসব উপ-সম্প্রদায় এমন গোপনে গঠিত হয় যে, সাধারণ্যে সব সময় তাহার প্রচারও বড় একটা হয় না। কেহ কেহ তাঁহার

গুরুকেই তৎ-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন এবং সেই গুরুর তিরোধানে তাঁহার শিষ্যবর্গ আর সেই মতবাদের প্রচার এবং প্রসারের সুবিধা করিতে পারেন না বলিয়া সেই মতবাদ ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যায়। এমনকি, তাঁহাদের সম্বন্ধে জানিবারও আর প্রামাণিক উপকরণ কিছু থাকে না। এই যে ৩৯টি উপ-সম্প্রদায়ের নাম দেওয়া হইল, তাহারও সবগুলি এখন বর্তমান নাই এবং ইহাদের অনেকগুলিরই উৎপত্তি এবং বিলুপ্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না, শুধু নাম-গুলিই ইহাদের অতীত অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে। তবুও ইহাদের সম্বন্ধে যতটুকু যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাই নিম্নে দেওয়া হইল,—

কিশোরী ভজন

বাঙলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সময় কিশোরী ভজনের একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ে সহজিয়াদের মতো পুরুষে কৃষ্ণের এবং স্ত্রীতে কিশোরীর অর্থাৎ রাধার আরোপ করিয়া ভজন-সাধনের প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া কথিত আছে।[১] ডক্টর ফারকুহার মনে করেন, কিশোরী ভজন সম্প্রদায় বামাচারী শাক্তগণের অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেয়ঃ নহে।[২]

একবার ঢাকার সন্নিকটে কোন স্থানে (বর্তমানে পাকিস্তানে) এই সম্প্রদায়ের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে এই সম্প্রদায়ের অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।[৩]

১ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, (১ম প্রকাশ), পৃঃ ২৬৭

২ Dr. J. N. Farquhar—An outline of the Religious Literature of India, p. 312

৩ Melville T. Kennedy—The Chaitanya Movement, (1935, Calcutta) p. 211

গুরুপ্রসাদী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপ-সম্প্রদায়ের মধ্যে "গুরু-প্রসাদী" নামে একটি কুৎসিত প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া শোনা যায়। স্থানভেদে এই প্রথা "গুরুগাঁই" অথবা "ইন্দুপ্রসাদ" নামেও পরিচিত।[১]

এই প্রথানুসারে বিবাহিতা যুবতী রমণীকে প্রথমে গুরুর নিকট প্রেরণ করিতে হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ এইরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।[২] তাঁহার বিবৃতি হইতে জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রে গুরুগণ প্রহৃত হইয়া তবে এই প্রথা রদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এক সময়ে উড়িষ্যা অঞ্চলেরও কোন কোন স্থানে অনুরূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সেখানে রাজার নিকট স্ত্রীকে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। পরে একটি বালিশ পাঠান হইত। বর্তমানে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।[৩]

এক সময়ে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলিয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হাইকোর্টে একটি মামলায় প্রমাণিত হয়।[৪] সাধারণতঃ ইহাকে "Vallavacharyya Defamation Case" বলা হয়।

১ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, পৃঃ ১১০

২ হুতোম প্যাঁচার নক্সা (১ম ভাগ), পৃঃ ৬০ (প্রকাশক, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা—১৩৪৪)

৩ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, (পাদটীকা), পৃঃ ১১০

৪ "The extreme demands that all tne belongings of the disciple should be placed at the services of the Guru led to notorious abuses which were exposed in a famous trial in 1862 befor the High Court of Bombay."—

Dr. Ishwari Prasad—History of Medieval India, edition 1925, (footnote); p. 566

এই প্রথার অনুরূপ পদ্ধতি প্রাচ্য খণ্ডেরও স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল। সেখানে এই প্রথার নাম ছিল—"Jus Primae Noctis" (right of first night)[১]

হরিবোলা বা হরিবোলিয়া

'হরিনাম'—এই সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন এবং 'কীর্তন' করাই ইঁহাদের প্রধান ধর্মানুষ্ঠান। সম্ভবতঃ এই কারণেই এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে "হরিবোলা' বা "হরিবোলিয়া।" এই সম্প্রদায় কর্তৃক গীত একটি সংগীত :

কর হরিনাম গান।
আমার যাবে ভব ভয়, শুন ওরে মন,
জেনে শুনে না হইলে চেতন ॥

১ "......a custom alleged to have existed in mediaeval Europe giving the lord the right to sleep the first night with the bride of any one of his vassals. This custom is paralleled in various primitive societies; however, practically none of the evidence that we have deals with its actual enforcement in Europe, but only with the redemption dues which were paid under various significant names (cunnagium, cullage, ius cunni, etc.) to avoid its enforcement. The one document which appears to present it actually in action (decree of the Seneschal of Guyenne, 1302) has been challenged on several grounds. The question is violently controversial, and has been, especially in France, the subject of remarkable displays of embittered and scabrous learning. With some hesitation, it may be said that the weight of evidence does point to the existence of a such custom, at a very early date, in parts of France and possibly also in a few centres in Italy and Germany, but certainly not elsewhere. This observation refers merely to the existence of a recognized custom; irregular oppresion of this particular kind was no doubt frequent enough."—Encyclopaedia Britannica, vol. 13 (University of Chicago) 1947, p. 206

হরিনামের মরম জেনে, শিব জপেন আপন মনে
পঞ্চমুখে করেন সাধন।
তার সাক্ষী দেখ, জগাই-মাধাই গেল বৃন্দাবন॥
পঞ্চ পাপের পাপী হইলে, মুক্তি পায় সে হরি বলে,
এমনি প্রভু অধম-তারণ।
তার সাক্ষী দেখ, জগাই-মাধাই গেল বৃন্দাবন॥
ওরে আমার মন, বলি কথা শোন,
হরিনামে কর দিন গুজারণ,
অন্য চিন্তা ছাড়, গুরু চিন্তা কর,
ঐ পদে মন রাখ সর্ব্বক্ষণ॥[১]

এই সম্প্রদায়ের কোন জপমালা নাই। স্থানে স্থানে আখড়া আছে, কোন আখড়ায় রাধা-কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ দেখা যায় আবার কোন আখড়ায় কোনও বিগ্রহ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতো ইঁহারা গলায় তুলসী-কাষ্ঠের মালা ধারণ করেন। গৃহী ও উদাসীন দুই শ্রেণীর ভক্তই এই সম্প্রদায়ে আছে।

এক সময়ে কলিকাতা ববাহনগরে গোলকচাঁদ গোঁসাই-এর আখড়া ছিল। তাহা এই হরিবোলা বা হরিবোলিয়া সম্প্রদায়ের আখড়া নামে খ্যাত।[২]

পরমহংস সাজা

নির্দ্বন্দ ও নিরাগ্রহ হইয়া যাঁহারা শুধু তত্ত্বমার্গে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারাই পরমহংস। ইঁহারা সর্বদা শুদ্ধচিত্ত এবং লাভ-ক্ষতি সমানভাবে দেখেন। পরাৎপর ভগবচ্চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কর্মক্ষয়ের জন্যই ইঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণ। কাজেই ইঁহাদের সঙ্কল্প অত্যুত্তম এবং ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত

১ অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৭০

২ ঐ

ইঁহাদের কোন দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরমহংসের মাত্র বেশ গ্রহণ করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-সমাজ তথা সমগ্র মানব-সমাজের কণ্টকস্বরূপ।

নাথ-জায়া

বৌদ্ধদের একটি বৃহৎ অংশ হিন্দু-ধর্মের সহিত মিশিয়া গেলেও অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ যাঁহারা সহজযানের আদর্শকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন নাই। সহজযানের এইরূপ পরিণতিতে যে ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে একটিতে একান্তভাবে "কায়া-সাধনাকে" ধর্ম-সাধনার কেন্দ্ররূপে গৃহীত হয় এবং অপরটিতে রাধা-কৃষ্ণ লীলাবাদ 'প্রকৃতি-পুরুষ'-তত্ত্বরূপে গৃহীত হয়। প্রথমটির পরিণতিতে নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল এবং দ্বিতীয়টির পরিণতিতে সহজিয়া-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

তবে সহজযান হইতে নাথ-ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,[১] ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী,[২] ডক্টর শহীদুল্লাহ,[৩] ডক্টর সুশীলকুমার দে[৪] প্রভৃতির অভিমত এই যে, সহজিয়া-বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণের মতবাদ ও ধর্ম সাধনা হইতে নাথধর্মের উৎপত্তি। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে নাথ-সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী শিব-শাক্তবাদের উপরেই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত।[৫]

১ বৌদ্ধ গান দোহার ভূমিকা, পৃঃ ১৬

২ 'Religion' History of Bengal, Part 1. Chapter XIII, (Dacca University), p. 423

৩ 'শূন্য-পুরাণ'-এর ভূমিকা, পৃঃ ৩-৭

৪ 'Sanskrit Literature'—History of Bengal (Dacca University), Part 1, Chapter XI, pp. 338-39

৫ Obscure Religious Cults, pp. 227-28

যুগল-ভজন

বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ তাঁহাদের সাধনাকে 'রাগের ভজন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই রাগের ভজন কোন শাস্ত্রানুমোদিত ভজন নহে, ইহা একান্ত প্রেম-পীরিতি-মার্গের ভজন।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ রাধাকৃষ্ণ-যুগলকে মানবিক পুরুষ-প্রকৃতির তীব্র গভীর প্রেমে রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেমের এই যে সাধনা, ইহাই তাঁহাদের রাগের ভজন এবং এই প্রেমের মিলনই তাঁহাদের 'যুগল মিলন' বা 'যুগল-ভজন'। বৈষ্ণব-সহজিয়াগণের মতে এই 'যুগল-ভজন' বা 'রাগের ভজন' বেদ-বিধির বহির্ভূত—

রাগের ভজন যাজন কঠিন
আচার বিষম হয়।
বেদ বিধি ছাড়ে কুল পরিহরে
তবে হয় প্রেমোদয়॥[১]

অদ্বয়বাদী

যাঁহারা শুধু অদ্বয়তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু স্বীকার করেন না, তাঁহারাই অদ্বয়বাদী। ইহা একটি স্বতন্ত্র মতবাদ। কিন্তু যাঁহারা অদ্বয়বাদীর বেশ গ্রহণ করেন, অথচ নিয়ম-মাফিক কার্যাদি কিছুই করেন না, তাঁহাদের লইয়াই যত বিশৃঙ্খলা।

আশ্রমরোধী

চতুরাশ্রমের যে কোন একটির আশ্রয়েথাকাই বিধি—"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।" কিন্তু যাঁহারা কোন আশ্রম স্বীকার করেন না, তাঁহারাই 'আশ্রমরোধী' বলিয়া মনে হয়।

মধ্ববিরোধী

যাঁহারা মধ্ব মতের বিরোধিতা করেন, তাঁহারাই মধ্ববিরোধী বলিয়া মনে হয়।

১ মণীন্দ্রমোহন বসু—সহজিয়া সাহিত্য, পৃঃ ৩৪

সেবাপরাধী

যাঁহারা সেবাপরাধ করেন তাঁহারাই সেবাপরাধী। 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' গ্রন্থে (পূর্ব, ২য় লহরী) এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে—

১। যানবাহনে চড়িয়া অথবা পাদুকা পরিধান করিয়া মন্দিরে গমন।

২। ভগবানের প্রীতির জন্য দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসবাদি না করা।

৩। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম না করা।

৪। উচ্ছিষ্টলিপ্তদেহে অথবা অশৌচ অবস্থায় ভগবানের পূজাদি করা।

৫। এক হস্তদ্বারা প্রণাম করা।

৬। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রদক্ষিণ।

৭। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পদ-প্রসারণ।

৮। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন করিয়া উপবেশন।

৯। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে শয়ন।

১০। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে ভোজন।

১১। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে মিথ্যাভাষণ।

১২। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ।

১৩। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে পরস্পর কথোপকথন।

১৪। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে রোদন।

১৫। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে কলহ।

১৬। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে কাহারও প্রতি নিগ্রহ।

১৭। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে কাহাকেও অনুগ্রহ করা।

১৮। শ্রীমূর্তির অগ্রে সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ।

১৯। কম্বল গায়ে দিয়া সেবাদি করা।

২০। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে পর-নিন্দা।

২১। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে পর-স্তুতি।

২২। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে অশ্লীল-ভাষণ।

২৩। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে অধো-বায়ু নিঃসরণ।

২৪। সামর্থ্য থাকিতেও অল্প-ব্যয়ে পূজা-উৎসবাদি নির্বাহ করা।

২৫। অনিবেদিত আহার্য গ্রহণ।

২৬। যে কালে যে ফল বা শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা সেই সময়ে ভগবানকে সমর্পণ না করা।

২৭। আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ প্রথমে অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবানকে নিবেদন।

২৮। শ্রীমূর্তিকে পিছনে রাখিয়া উপবেশন।

২৯। শ্রীমূর্তির অগ্রে অন্যকে অভিবাদন।

৩০। গুরুদেবের সম্মুখে কোন স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে উপবেশন।

৩১। নিজেই নিজের প্রশংসা করা।

৩২। দেবতা-নিন্দন।

ইহা ছাড়া বরাহ-পুরাণে আরও সেবাপরাধের উল্লেখ আছে—

১। রাজান্ন ভক্ষণ।

২। অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্তি-স্পর্শন।

৩। বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া হরির উপাসনা।

৪। বাদ্য না করিয়া মন্দির-দ্বার উদ্‌ঘাটন।

৫। যে দ্রব্যে কুকুর দৃষ্টি দিয়াছে তদ্দ্বারা ভক্ষ-দ্রব্যের সংগ্রহ করণ।

৬। পূজাকালে মৌনভঙ্গ।

৭। পূজা করিতে করিতে মল-ত্যাগার্থ গমন।

৮। গন্ধ-মাল্য প্রদান না করিয়া অগ্রে ধূপ দান।

৯। অযোগ্য পুষ্পে পূজন।

১০। দন্তধাবন না করা।

১১। দন্তধাবন না করিয়া স্ত্রী-সম্ভোগ।

১২। রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ।

১৩। রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত এবং মলিন বস্ত্র পরিধান।

১৪। অপান বায়ু পরিত্যাগ।

১৫। ক্রোধ করা।

১৬। গাঁজা পান।

১৭। অহিফেন সেবন।

১৮। তৈল মর্দন করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করা।

অন্যত্র আছে—

১। ভগবৎ-শাস্ত্রের প্রতি অনাদর।

২। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে তাম্বুল চর্বন।

৩। এরণ্ড-পত্রস্থ পুষ্প দ্বারা অর্চন।

৪। ভূমিতে উপবেশন করিয়া পূজা করা।

৫। স্নানকালে বাম হস্তে শ্রীমূর্তি-স্পর্শন।

৬। পূজাকালে থুথু ফেলা।

৭। পূজাবিষয়ে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন।

৮। তির্যক পুণ্ড্র ধারণ।

৯। পদ-প্রক্ষালন না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ।

১০। অবৈষ্ণবের পাককরা অন্নে ভগবানকে নিবেদন।

১১। অবৈষ্ণবের সম্মুখে বিষ্ণু-পূজন।

১২। গণেশের পূজা না করিয়া বিষ্ণু-পূজন।

১৩। নখ-স্পৃষ্ঠ জলে শ্রীমূর্তির স্নপন।

১৪। ঘর্মাক্তদেহে হরি-পূজন।

১৫। নির্মাল্য লঙ্ঘন।

১৬। ভগবানের নামে শপথাদিকরণ।

যাহারা নামাপরাধ করে, তাহারাই নামাপরাধী। 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে (পূর্ব, ২য় লহরী) দশপ্রকারের নামাপরাধের কথা বলা হইয়াছে—

১ সন্তের নিন্দা।

২ বিষ্ণুনাম হইতে পৃথকরূপে শিবনামাদির চিন্তা

৩ গুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ।

৪ বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা।

৫ হরিনামের মাহাত্ম্যে অর্থবাদ করা।

৬ প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পনা করা।

৭ নামবলে পাপের প্রবৃত্তি।

৮ অন্য শুভকর্মের সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তন।

৯ শ্রদ্ধাবিহীন জনকে নামোপদেশ।

১০ নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে অপ্রীতি।

বৈষ্ণবাপরাধী

বৈষ্ণবদিগকে যাঁহারা নিন্দাদি করেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারাই "বৈষ্ণবাপরাধী"। বৈষ্ণবগণকে নিন্দা করা দোষের বলিয়া "হরিভক্তিবিলাসে" বলা হইয়াছে।

স্কন্দ পুরাণে (মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ সংবাদে) আছে—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়াঃ বৈষ্ণাবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌবসজ্ঞিতে ॥[১]

দ্বারকা মাহাত্ম্যেও দেখা যায়—"প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে।"[২]

নামাপরাধী

পদ্ম-পুরাণে 'যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে' দেখা যায়—

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণবাদরতো বিপ্রঃ স নরো নরকাতিথিঃ ॥[৩]

১ হরিভক্তি বিলাসে উদ্ধৃত।

২ ঐ

৩ ঐ

ধামাপরাধী

ভগবৎ-ধাম অর্থাৎ তীর্থক্ষেত্রসমূহের যাঁহারা নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহারাই ধামাপরাধী বলিয়া মনে হয়।

দাদা ও মা

জনশ্রুতি এই যে, বরিশাল জিলার (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে) রণমতি গ্রামের বিধুভূষণ সরকার এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। তিনি ১৩৫২ বঙ্গাব্দে "শ্রীদাদা ও শ্রীমা" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।[১]

হরিদাস

স্বামী হরিদাস প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় হরিদাস সম্প্রদায়, হরিদাসী সম্প্রদায় বা সখী-সম্প্রদায় নামে খ্যাত। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন, হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের নিজেদের কোনও দার্শনিক মতবাদ ছিল না, ছিল শুধু বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতি। এই সাধন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইল সখীভাবে সাধনা।

হরিদাস স্বামী একমাত্র সখীভাবের সাধনাকেই সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রেম-ভক্তির নিয়ম ছিল শুধু রাধা-কৃষ্ণ যুগলের পূজা। রাধার সঙ্গে কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণই ইঁহাদের উপাস্য।[২]

এতদ্ব্যতীত উপরি-লিখিত কবিতা-ধৃত ভজন খাজা, গুরু-ভোগী, অসীমাত্যজা, দারী সন্ন্যাসী, শিষ্যা-বিলাসী, উপনয়ন-ত্যজা, অসৎ-সঙ্গ, দ্বিপাদ-ভঙ্গ, রামদাস, নিতাই-রাধা-গৌর-শ্যাম, সীতারামিয়া, রাধাশ্যামিয়া, শাউডীর দল, ঘর-পাগলা, গৃহী-বাউলা, বর্ণ-বিরাগী, গৈরিক-বিরোধী, কানুপ্রিয়া, গৌড়েশ্বর, বংশীধর, উলই-চণ্ডীবাদ, স্মরণপন্থী প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য কিছু পাওয়া না গেলেও

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য (পরিশিষ্ট), পৃঃ ৭

২ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃঃ ২৯৭

এইসব নাম দেখিয়াই বুঝা যায় যে, এইসব সম্প্রদায় সহজিয়াদেরই রকমফের।

অক্ষয়কুমার দত্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরও কতকগুলি উপ-শাখার কথা বলিয়াছেন,—

স্পষ্ট-দায়ক

এই উপ-শাখার বৈষ্ণবগণ দীক্ষা গুরুর একাধিপত্য স্বীকার করেন না। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা এক সঙ্গে একই আখড়ায় বাস করেন, অথচ কোন প্রকার দোষ-দুষ্ট হন না বলিয়া ইঁহারা বলিয়া থাকেন। সব জাতির গৃহস্থগণই এই সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে আসিতে পারেন, তবে উদাসীন বা উদাসিনী ব্যতীত কেহ গুরু হইতে পারেন না। ইঁহারা গলায় এক কণ্ঠী মালা পরেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অপেক্ষা কিছু ছোট আকারে তিলক-সেবা করেন। পুরুষগণ কৌপীন ও বহির্বাস ব্যবহার করেন এবং স্ত্রীলোকগণ সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া একটি ক্ষুদ্র শিখা মাত্র অবশিষ্ট রাখেন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ইঁহারা সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ বা চৈতন্যের প্রীতিতে নৃত্য-গীত করিয়া থাকেন। মিঃ উইলসন[১] মনে করেন, স্পষ্ট দায়ক, কর্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি সবগুলি প্রায় একই ধরনের সম্প্রদায়।

রামবল্লভী

হুগলী জিলার বংশবাটীর কয়েকজন লোক মিলিয়া রামবল্লভী নামে এক সম্প্রদায় গঠন করেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল রামবল্লভ। এই সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁহাকেই এই ধর্মের প্রবর্তক এবং শিব-স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। প্রতি বৎসর শিব-চতুর্দশীর দিনে এই প্রবর্তকের উদ্দেশ্যে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১ H. H. Wilson—Religious Sects of the Hindus, p. 170

এই সম্প্রদায়ের ভক্তগণ সব শাস্ত্র এবং দেবতাকে সমান জ্ঞান করেন। সেইজন্য ইঁহাদের উৎসবানুষ্ঠানে গীতা, কোরান, বাইবেল—এই তিনটি ধর্ম-গ্রন্থই পঠিত হয়। উৎসবানুষ্ঠানে খেচরান্ন, গো-মাংস প্রভৃতি সকল দ্রব্যই ভোগ দেওয়া হয়। ইহাদের ধর্মানুমোদিত সংগীত :

কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা—কোন নামে নাহি বাধা,
বন্দীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলেরে।
মন কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা বলরে॥

সাহেব ধনী

কৃষ্ণনগরের (নদীয়া) কাছে শালিগ্রাম, দো-গাছিয়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের এক বনে এক উদাসীন বাস করিতেন। বাগাড়ে গ্রামের রঘুনাথ দাস, দো-গাছিয়া গ্রামের দুঃখীরাম পাল ও আরও কয়েক ব্যক্তি এবং একজন মুসলমান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উদাসীনের নাম ছিল—সাহেব ধনী। ইহা হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম হয় সাহেব ধনী।

ইঁহারা কোন বিগ্রহের পূজা করেন না। ইঁহাদের উপাসনা-স্থানের নাম—'আসন'। এই আসন একখানি 'চৌকি' মাত্র। প্রতি বৃহস্পতিবারে এই আসন-স্থানে সকলে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিবার বিধি আছে। এই সময়ে অনেক রোগীও রোগমুক্ত হইবার আশায় এখানে আসেন।

ইঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন না। হিন্দুদিগকে ইঁহারা "ক্লীং দীননাথ দীনবন্ধু" এবং মুসলমানদিগকে "দীনদয়াল দীনবন্ধু" মন্ত্রে দীক্ষা দেন। চৈত্রমাসে অগ্রদ্বীপে ইঁহাদের একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

খুশী বিশ্বাসী

নদীয়া জিলার দেবগ্রামের নিকটবর্তী-'ভাগা'-নামক গ্রামের খুশী বিশ্বাস এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। খুশী বিশ্বাস জাতিতে মুসলমান

ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের ভক্তগণ খুশী বিশ্বাসকে চৈতন্যদেবের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। ইঁহারা জাতিভেদ মানেন না।

জগন্মোহনী সম্প্রদায়

রামকৃষ্ণ গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। এই সম্প্রদায়ের ভক্তগণের ধারণা, বহুপূর্বে জগন্মোহন গোঁসাই নামে জনৈক সাধক এই ধর্মের প্রথম প্রবর্তক। এইজন্য তাঁহারই নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম---'জগন্মোহিনী সম্প্রদায়। ইঁহারা নির্গুণ উপাসক।

রাত ভিখারী

এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, যাঁহারা রাতে এক প্রহর সময় পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া জীবিকার্জন করেন। ইঁহারাই রাত ভিখারী। শুক্ল-পক্ষের পঞ্চমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই ভিক্ষার প্রশস্ত সময়।

এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ 'ভেক' গ্রহণের সময়ই এই বৃত্তি অবলম্বন করেন। ভেক গ্রহণের দিন সন্ধ্যায় তিন বাড়ী হইতে ভিক্ষা করিতে হয়।

বলরামী

বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁহার নিবাস ছিল নদীয়া জিলার মেহেরপুর শহরের (বর্তমানে পাকিস্তানে কুষ্টিয়া জিলার অন্তর্গত) মালোপাড়ায়। বলরামের পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম গৌরমণি।

মেহেরপুর অঞ্চলের জমিদার ছিলেন মল্লিক বাবুরা। বলরাম ছিলেন তাঁহাদের বাড়ীর পাহারাদার। একবার মল্লিকবাবুদের গৃহ-দেবতার অলঙ্কার চুরি যায়। ইহাতে মল্লিকবাবুরা বলরামকে কিছু শাসন করেন। তাহাতে বলরামের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং পরে উদাসীন হইয়া গৃহত্যাগ করেন। গেরুয়াবেশধারী বলরাম তখন এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন এবং তাঁহার নামানুসারে

এই সম্প্রদায়কে 'বলরামী' সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা হয়। ইঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন না।

১২৫৭ বঙ্গাব্দের (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ৩০ এ অগ্রহায়ণ অনুমান ৬৫ বৎসর বয়সে বলরাম দেহত্যাগ করেন।

সাধ্বিনী

প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণই এই সম্প্রদায়ের পরমার্থ সাধন। ইঁহারা সকল জাতির অন্নই গ্রহণ করেন। মদ্য, মাংস প্রভৃতি গ্রহণেও ইঁহাদের বাধা নাই। সতত কটুবাক্য ভাষণই ইঁহাদের নীতি। ইঁহারা গৃহবাসীও হন না, দারপরিগ্রহও করেন না।

নবম অধ্যায়

কথা শেষ

ইতিহাসের যুক্তি-দিয়া এই গ্রন্থের অবতারণা। সেই যুক্তিরই ক্রমানুশীলনের প্রয়াস পর পর আটটি অধ্যায় ব্যাপিয়া। এই সুবিস্তৃত তথ্য বিবৃতি ভেদ করিয়া ইতিহাসের কোন্ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছে, গ্রন্থ-শেষে একটি অধ্যায়ে তাহার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এতক্ষণ ছিলাম ঘটনা-বৈচিত্র্যের অন্তরালে, এখন বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিষয়কে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিয়া বুঝিবারও আবশ্যকতা আছে।

বাঙালী জাতির ইতিহাস খুব বেশীদিনের নয়। মোটামুটি দুই হাজার বছর, কি তাহারও কম সময় লইয়া বাঙালীর অতীত ইতিহাস। গুপ্ত-যুগ হইতে বাঙলার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গেলেও সেন-রাজাদের আমলেই হিন্দু বাঙালী সমাজ মোটামুটি পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে। ইহার পর বহিয়া যায় তুর্কী আক্রমণের প্রবল ঝঞ্ঝা। বাঙালী জাতি যেন মূর্ছাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং দীর্ঘ দুইশত বৎসর তাহার এইভাবেই অতিবাহিত হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে এই জাতি আবার চোখ মেলিয়া তাকায় এবং দেখিতে পায় তাহার জীবনদেবতা তাহার সম্মুখেই দণ্ডায়মান—

"বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া, নিমাই ধরেছে কায়া।"

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ মানস-মুক্তির যে পরম উল্লাস, বাঙলার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এ যেন যাদু-বিদ্যার বলে জাতির সমস্ত সুপ্ত-চেতনার অভূতপূর্ব জাগরণ। সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। বিরুদ্ধ-শক্তি এবং প্রতিকূল সমাজ-ব্যবস্থা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল; কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু বৃহত্তম সমাজ শ্রীচৈতন্যের ভিতর নিজের স্বীকৃতি খুঁজিয়া পাইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাকে আপনজন বলিয়া

মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। তাই ইতিহাসের চিরাচরিত পথে রাজা-রাজড়ার উত্থান-পতন, নবাব-বেগমের ব্যর্থ প্রেম-কাহিনীর সহজ, সুগম পথ ছাড়িয়া সেই যুগ-সন্ধিক্ষণের উদ্বেলিত সমাজজীবন, সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, আশা-নিরাশার মধ্যে ও মহৎ জীবনকে স্পর্শ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ইহার পূর্বে বাঙলীর কয়েকটি গৌরবময় যুগ ইতিহাসের বিবর্তন ধারায় প্রত্যক্ষ হইলেও জাতীয় জীবনে সার্থক হইয়া উঠে নাই। বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্ক প্রথম সার্বভৌম নরপতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিলেও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং অন্তর্বিদ্রোহের ফলে বহিঃশত্রুর আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়। সেইজন্য পরবর্তী একশত বৎসর, গৌড়ের ইতিহাসে এক 'অন্ধকার যুগ' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।[১] পাল-সাম্রাজ্য বাঙালী সম্রাটের সার্বভৌম রাজ্যাবস্তারের সাক্ষ্যরূপে মাঝে মাঝে জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেও শেষ পর্যন্ত তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সেন রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব তথা আর্য-ধর্মের ধারক। এই সময়ে ধর্ম ও সমাজ সংগঠনে সক্রিয়তা দেখা যায়। বৌদ্ধ-ধর্মের উন্মূলন ও হিন্দু-ধর্মের পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টাও চলে। ফলে এই ভাঙা-গড়ার যুগে হিন্দু-ধর্মের পৌরাণিক রূপ গ্রহণে এবং আর্য ও অনার্য-ধর্মের সমীকরণে এক নূতন ধর্ম সাধনার প্রথম প্রয়াস দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মের অবসানে সাহিত্য-সাধনার ধারা পৌরাণিক পৌরাণিক কৃষ্টির নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। জয়দেবের "গীত-গোবিন্দ" ও বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-ভাবিত কাব্য হিসাবে চৈতন্যধর্মের অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করে। উভয় কাব্যেই পাইলাম আমরা বাঙালী কাব্য প্রতিভার অপূর্ব পরিচয়। এই প্রতিভার আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াই উত্তরকালে বাঙালী জাতি বুঝি চৈতন্য-ধর্ম-বিপ্লবরূপ মহা-সাগরের বিরাট উচ্ছ্বাসকে আপন মনো-মন্দিরে ধারণের ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে।

---

১ সংস্কৃতে এইরূপ অরাজকতার নাম—'মাৎস্য-ন্যায়'।

দ্বাদশ শতকের শেষে তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙলার রাজনৈতিক কাঠামোই শুধু ভাঙিয়া পড়ে না, সামাজিক জীবনেও এক দারুণ বিপর্যয় দেখা দেয় এবং সমাজ-বিন্যাসে ক্ষীয়মাণ বৌদ্ধ সামাজিকতার শেষ ধ্বংস-স্তূপের উপর বর্ণাশ্রম ধর্মের বিবর্তন বহু জাতির ভেদ-তত্ত্বে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পায়। পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই সমাজ গঠন প্রণালী এবং উহার স্মৃতি-শাসিত সংস্কার-সংস্কৃতি এক রকম স্থিরীকৃত হইয়া গেল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত অনার্য জনমণ্ডলী মিলন ও বিরোধের ভিতর দিয়া যখন হিন্দু সমাজের সন্নিহিত হইল, তখন একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারে প্রয়াস পাইল। ফলে অনার্য জনসংঘ এবং তাহার দেব-দেবী ও পূজা পদ্ধতি হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া এক নূতন জাতীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইল। ইতিমধ্যে মুসলমান ধর্মের বান ডাকিল। পতিতেরা সেই ডাকে সাড়া দিল। সাম্যবাদের সঙ্গে যখন রাজ-নীতিক সুবিধাও ইস্‌লামীয় সমাজ দিতে লাগিল, তখন সেই আকর্ষণের তরঙ্গ রোধের ক্ষমতা আর কাহারও রহিল না।

এই বিপর্যয়ের মধ্যেও বাঙালীর মনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার মধুর সংগীত গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতেছিল। বাঙলার সমসাময়িক ইতিহাসে বাঙালীর মনের এই ভাব-পরিবর্তনের অবশ্য কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বাঙলার এই দারুণ দুর্দিনেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। গ্রহণ-মুক্তির ক্ষণে শঙ্খধ্বনি ও হরিনাম মুখরিত নবদ্বীপে চৈতন্যের জন্ম মানুষের জীবনধারায় যেন একটা আত্ম-পরিচয় লাভ করিল। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব যদি সে সময় না হইত, তাহা হইলে বাঙালীর আত্ম-পরিচিতি আজ কি ভাবে প্রকাশ পাইত তাহা বলা না গেলেও একথা নিশ্চিত যে ধর্মকর্ম এবং সমাজজীবনে বাঙালীর কৃষ্টি আজ যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনটি ঠিক হইত না।

তবে কখন এবং কি ভাবে মানুষের পরিবর্তন হয়, তাহা বলা কঠিন। মানব-মনের গভীর গহনের শেষ-কথা বোধ হয় আজও কেহ

জানিতে পারে নাই। আবার ব্যক্তি-বিশেষ বা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রভাবে জীবনের পরিবর্তন হয় এ যুক্তিও অচল। ধীবর-গৃহিণীর "বেলা গেল", অথবা রজকিনীর "বাসনায় আগুন দেও"—এই সামান্য কথায় বিপুল-বিত্তের অধিকারী চিরদিনের জন্য সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন—এ কথাও যেমন সত্য, আবার সাধু-সন্তের সাহচর্যে মানুষের পরিবর্তন ঘটিয়া দীর্ঘদিন তাহা স্থায়ী হয় নাই, এ কথাও তেমন সত্য।

যিনি জনগণের সমক্ষে নিজের সব কিছু আচরণের দ্বারা মানবতার পথে অভিযান করিবার আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাদের চিত্তে স্থৈর্য এবং জীবনে স্থিরত্ব আনিয়া দিয়াছেন, এমন চিত্র জগতে প্রায়শঃ বিরল। এই বিরল-গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা অবিসংবাদিতরূপে এক বিরাট অধ্যায়ের সংযোজন এবং এই জন্যই মানবেতিহাসে তিনি 'মহাপ্রভু'। মহাপ্রভু—কেবলমাত্র ভাব বাচক বিশেষণ নহে, ইহার অন্তর্নিহিত সত্যই ক্লান্ত, পীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত মানব-সমাজের পরম আশ্রয়স্থল।

এই মহাপ্রভুর প্রভাবেই জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ এক নূতন ধর্মে গড়িয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদ ভুলিয়াছে। শ্রীচৈতন্য স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, সকল বিভিন্নতা দূর করিয়া এক অখণ্ড মানব-জাতি গড়িয়া তুলিতে পারিলে তবেই হইবে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ এবং সেই সমাজের জন্য যাহা কিছু করা হইবে, তাহা হইবে সেই অখণ্ড জাতিরই মঙ্গল-সাধন

এইজন্য চৈতন্যের প্রেরণায় বাঙলাদেশে একদিকে যেমন ভক্তির বান ডাকিল, অন্যদিকে তেমনি বাঙলার সামাজিক জীবনকে দৃঢ় ও সংযত করিবারও একটা বিপুল প্রয়াস দেখা দিল। তাই দেখা যায়, চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া সে-যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র-মাধুর্য বাঙালীর মনে একটা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের কঠোরতা দূরে রাখিয়া চৈতন্যদেব ধর্মকে এক নব-অনুরাগে রঞ্জিত করিবার প্রেরণা দান করেন। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের বাহিরে, জাগতিক প্রতিপত্তির বাহিরে,

জীবন এক নূতন মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে এবং এই মহিমময় আদর্শ উচ্চ-নীচভেদে সকলের মনেই প্রেরণা যোগায়। দেখিতে দেখিতে অতি সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে মহাপুরুষেরা জাগিয়া উঠেন। হরিদাস, নরহরি সরকার, শ্রীবাস, লোকনাথ, রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস গোস্বামী, রামানন্দ রায়, বাসুদেব সার্বভৌম, মুরারি গুপ্ত, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির নাম বাঙলার ইতিহাসে ধর্মজীবন ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে অমর হইয়া থাকিবে। ইহারা প্রত্যেকে তাঁহাদের অপূর্ব জীবন-সাধনার দ্বারা আমাদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

আমাদের ইতিহাস কিন্তু সে সময়ের এইসব সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে নীরব। ইঁহাদের কাহিনী ছড়াইয়া আছে বিভিন্ন বৈষ্ণব-চরিত কাব্যের মধ্যে। শ্রীচৈতন্যের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া বৈষ্ণবাচার্যগণ যে প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, তাহাতে বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি দিক বিশেষভাবে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বাঙালীর মনস্বিতার বড় পরিচয় যেমন নব্য-ন্যায়, স্মৃতি-শাস্ত্র প্রভৃতি প্রণয়নে, তেমনি বৈষ্ণবাচার্যগণ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবদর্শন, রসশাস্ত্র, কাব্য-নাটক, টীকা প্রভৃতি রচনা বিদ্যা ও বুদ্ধির দিক হইতে বাঙালী সংস্কৃতির অপূর্ব সৃষ্টি। বাঙলার রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ, গদাধর, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, বুনো রমানাথ প্রভৃতি মনীষিগণের প্রতিভার দানে বাঙলার মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি রূপ, সনাতন, শ্রীজীব প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের অপূর্ব ভক্তি ও পাণ্ডিত্য আজ পর্যন্তও বাঙালীর সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড হইয়া আছে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ "হরিভক্তিবিলাস" সনাতন পন্থিগণের স্মৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া এক নবযুগ গঠনের প্রেরণা দিয়াছে।

আবার বৈষ্ণব-পদাবলীতেও বাঙালীর হৃদয়ের তীব্র রসানুভূতির যে পরিচয় মেলে, তাহাও শ্রীচৈতন্যেরই অনুপ্রেরণার ফল।

শ্রীচৈতন্য গ্রন্থ-পাণ্ডিত্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়াও নীলাচলে অন্তরঙ্গ পরিকরগণের সঙ্গে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী আস্বাদন করিতেন। বাঙালীও তাই মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণে বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক মৈথিল-পদাবলী আপনার করিয়া লইয়াছিল। ভাব ও ভাষায় বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুকরণ-প্রয়াসের ফলে মৈথিল-বাঙলার সংমিশ্রণে চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তারা যে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা 'ব্রজবুলী'র সৃষ্টি করেন, তাহার মত "রসনারোচন শ্রবণ-বিলাস" সুললিত ভাষা আজ পর্যন্তও আর কেহ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহা ছাড়া কীর্তন গানও বঙ্গসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। শ্রীচৈতন্যের প্রসাদস্বরূপ বাঙলার জনসংগীত এই কীর্তনগান আজও আমাদের প্রাণধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। চৈতন্যোত্তর যুগে যে লীলাকীর্তন ভক্তিরস প্রকাশের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিভিন্ন সাধক-ভক্তের হাতে গরাণহাটি, মনোহরসাহী, রেণেটি, মন্দারিণী, ঝাড়খণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন ঢঙ-এ গড়িয়া উঠে, তাহাতে বাঙালীর নিজস্ব সংগীত-শিল্পের এক-একটি বিশিষ্ট ঘরানাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সব কীর্তনে রসের বিন্যাসদ্বারা সেই রাধা-কৃষ্ণলীলারই যেন বাস্তব-রূপ দান করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর এবং শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী। এই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাকে কেন্দ্র করিয়া ললিতা-বিশাখাদি সখীবৃন্দ যমুনা পুলিনে এক প্রেমের হাট বসাইযাছিলেন। বৈষ্ণব কবিতা ইঁহাদের এই অহৈতুক প্রীতির জয়গাথা এবং লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন যেন তাহার সজীব রূপ। এইজন্য পদাবলী যেমন 'সসীমের সঙ্গে অসীমের প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্যের লীলানুভূতি ধারণে একটা স্বপ্নানন্দী উচ্ছ্বাস', কীর্তন সেইরূপ 'জীব-হৃদয়ের দিক হইতে অচিন্ত্যের সাহজিক প্রেমে রস-রহস্যের যেন একটা স্বপ্ন-বিলাস'। বৈষ্ণব কবি এই অপ্রাকৃত প্রেমের যে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাই কীর্তনের আসরে গীত হয় এবং তাহার সঙ্গে আরও কথা জুড়িয়া সুরের বেদনায়

তাহাকে ফুটাইয়া তোলা হয়। তত্ত্ব ও লীলার সঙ্গে যে নিগূঢ় রস-রহস্যের সম্বন্ধ, কথকথায় বা ভাগবত ব্যাখ্যায় বক্তা তাহা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কীর্তনে করা হয় লীলার চমৎকারিত্ব বর্ণনা—তত্ত্ব কথায় তাহাকে রূপকমাত্রে পরিণত করিবার প্রয়াস এখানে নাই। এইজন্য রসের বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব প্রভৃতি ক্রম অনুশীলন করিয়া এক-একটি 'পালা'র জন্য এক-একটি কাহিনী গড়িয়া তোলা হয়। বিভিন্ন মহাজনের বিভিন্ন পদ একটির পর একটি সাজাইয়া কীর্তনে এইভাবে লীলা-মাধুর্যের যে মাল্য রচনা করা হয়, তাহাতে কথা, ভাব ও সুর একাধারে মিশিয়া গিয়া মধুর রসপ্রবাহের সৃষ্টি করে। কাজেই এই যে ভক্তি-রস তাহা কাব্যেরও প্রাণ। এইভাবে ভক্তির রসত্ব স্থাপন দ্বারা অলঙ্কার শাস্ত্রের যে নবতম অধ্যায়ের সংযোজন, তাহা বাঙালীর প্রতিভারই একটা উজ্জ্বল দিক।

ভক্তিরসের প্রতিষ্ঠার পর অনুশাসনমূলক শাস্ত্রের প্রভাব কমিয়া আসিলে আদর্শের সহিত বাস্তব জীবনের একটা সমন্বয়সাধনের প্রয়াস দেখা যায়। ফলে সর্বত্রই একটা জীবননিষ্ঠতা দেখা দেয়। কাব্য ও ধর্মের আদর্শ যদি কখন মানুষের বাস্তব জীবনে রূপান্তরিত হইয়া থাকে, তবে তাহা একমাত্র চৈতন্য যুগেই হইয়াছিল। এই মানস-মুক্তির ফলেই ঘরমুখো বাঙালী ঘর ছাড়িয়া দেশ-দেশান্তরে যাইতে শিখিল, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক গৌরবময় বৃহৎ-বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিল। মুসলমান যুগের বাঙলায় শ্রীচৈতন্যর পরিকরবৃন্দের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম ছাড়া আর কোনও আন্তর্ভারতীয় আন্দোলন বাঙলাদেশ হইতে উদ্ভব হয় নাই।

ইহার পর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙলা ভাঙন ও নব জাগরণের মহালগ্ন। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও হিন্দু এই তিন সভ্যতার সংঘর্ষে দেশে এক নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল। তবে বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সেদিন সর্বাপেক্ষা বেশী প্রলুব্ধ করিয়াছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি। ফলে বাঙালী অন্ধভাবে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অনুকরণ করিয়া বসিল।

তবে ইহা মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইহা প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তাই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় জীবন-রসকে নূতনভাবে অনুভব করিতে চাহিলেও বাস্তব সমাজের মধ্যে তাহার উপযোগী পোষণ-ক্ষেত্র খুঁজিয়া পায় নাই। কাজেই এই নব জাগরণকে সর্বাঙ্গীণ মানস-মুক্তির প্রাণময় প্রকাশরূপে অভিহিত করা যায় না। পাশ্চাত্য প্রেরণায় দেশে বিচিত্র প্রতিভার প্রকাশ হইলেও সেই প্রতিভার আলোক সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এদিক দিয়া বিচার করিলে চৈতন্য-যুগের ভাব-উদ্বোধন শক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

মুঘল সাম্রাজ্যবাদ বাঙলার সামন্ততন্ত্রবাদের অবসান ঘটায়। সেই সঙ্গে বাঙলার হিন্দুর স্বাধীনতা বা অর্ধ-স্বাধীনতা ভোগের সুবিধাও চলিয়া যায়। দেশের এই অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে রঘুনন্দনের নব্য-স্মৃতিতে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিবার প্রয়াস দেখা যায়, তখন ব্রাহ্মণেতর জাতি নিজেদের দুর্দশার কথা ভাবিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়ে। দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত আর কোনও বর্ণ নাই। এই সিদ্ধান্তদ্বারা ব্রাহ্মণ্য-পুরোহিত-বাদ অপ্রতিহত হয়। সমাজের এই সব সমস্যার কথা বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য ভাল ভাবে অবগত ছিলেন। এই জন্যই তিনি শ্রীচৈতন্যকে দেশের অগণিত, মূর্খ, নীচ পতিত, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতিকে কৃপা করিতে বলিয়াছিলেন।[১]

চৈতন্যদেবও অদ্বৈতের প্রস্তাব অঙ্গীকার করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি খোলা-বেচা শ্রীধরের বাড়ী গিয়া তাহার ভগ্নলৌহ পাত্রে জলপান করিলেন।[২] একবার কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তিনি নিজ অঙ্গের যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া ফেলেন এবং হরিদাসকে বলেন—

১ চৈতন্য ভাগবত, মধ্য—১০ম অধ্যায় এবং মধ্য—৬ষ্ঠ অধ্যায়।
২ চৈতন্য চরিতামৃত, আদি, ১০ম পরিচ্ছেদ।

এই মোর দেহ হতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দৃঢ়।[১]

ইহার পর একবার তিনি মন্তব্য করেন—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি সে মরে॥[২]

এমন কি পুরীধামে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বর্ণশ্রেষ্ঠ বাসুদেব সার্বভৌমকে তিনি অরুণোদয়কালে জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়াছিলেন—

সন্ধ্যা স্নান দন্ত ধাবন যদ্যপি না কৈল।
চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল॥[৩]

এই সব কার্যাবলীর দরুন বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ছুঁই-ছুঁই ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। পুরীতে বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে জগন্নাথদেব বলিলেন—

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি॥[৪]

এইভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের রজ্জুবন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িল। পাতিত্য দোষ, জন্মগত দোষ, অন্যান্য সামাজিক-দোষদুষ্ট লোকেরা বৈষ্ণবসমাজে ঠাঁই পাইতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতিকূল আচরণ সত্ত্বেও দেশের মধ্যে সর্বত্রই একটা সার্বজনীন ভাব দেখা দিল। তবে উত্তরকালে যাঁহারা এই নব-বৈষ্ণবধর্মের কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহারা হইলেন বাঙলার গোস্বামি-প্রভুদের দল। এই সব গোস্বামিগণের সকলেই যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারিলেন, তাহাও বলা চলে না। এমন অনেক গোস্বামী আছেন, যাঁহারা শিক্ষা-দীক্ষায় হীন হইয়া শুধু 'গুরু

১ চৈতন্য-ভাগবত, মধ্য—১০ম অধ্যায়:
২ ঐ মধ্য—১০ম অধ্যায়।
৩ চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
৪ চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য—১০ম অধ্যায়।

গিরি'ই একটা পেশা হিসাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। দীক্ষা-দান বা অন্য ধর্ম-কর্ম বিষয়ে 'হরিভক্তিবিলাসের' বিধানের সঙ্গেও ইঁহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। ফল হইয়াছে এই যে, অনেকে এই সব গোস্বামিগণকে পরিত্যাগ করিয়া সাধু-সন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। আবার এমন অনেক গোস্বামি-সন্তান আছেন, যাঁহারা বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া অন্য-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এইরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য শিষ্য-ব্যবসায় অবলম্বনে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ফলে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে গোস্বামিগণের প্রভাব দিন-দিনই কমিয়া আসিতেছে। অবশ্য সর্বপ্রকারে উপযুক্ত ও শিক্ষিত গোস্বামি-সন্তানের যে সমাজে একবারে অভাব আছে তাহা নহে। তবে তাঁহাদের সংখ্যা কম।

এই যুগে দুই শ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়,—এক দল হইল "বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত বৈষ্ণব," আর এক দল হইল "জাত বৈষ্ণব।" উচ্চ জাতির লোকে যখন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে তখন তাহারা ধর্মের তথাকথিত আধ্যাত্মিক বিধিসমূহই গ্রহণ করে এবং সামাজিক ব্যাপারে স্মার্তমতই-মানিয়া চলে। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদ এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্বে গোস্বামিগণের সহিত আহার-বিহারে স্মার্তব্রাহ্মণ-সমাজের কিছু অমত ছিল। এখন আর তাহা নাই। এখন স্মার্ত ও গোস্বামি-ব্রাহ্মণ-সমাজ একীভূত হইতে চলিয়াছে। তবে এই মিলনের মধ্যেও কিছুটা বিভেদও আজ রহিয়া গিয়াছে। স্মার্তব্রাহ্মণগণ যে সব স্থানে যান না, সেখানে গোস্বামিগণ আজও গিয়া মহাপ্রভুর ভোগরাগ ও মহোৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। বুঝি এইভাবে মহাপ্রভুর কৃপা-কণার শেষ চিহ্নটুকু আজও জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী

ক। বাঙলা

অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী —গৌড়ীয় কণ্ঠহার, গৌড়ীয় মঠ।

অনুকূলচন্দ্র সেন —বর্ধমান পরিচিতি।

অক্ষয়কুমার দত্ত —ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ।

অমূল্যধন রায় ভট্ট —বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব চরিত অভিধান (চ-পর্যন্ত)

ঐ —দ্বাদশ গোপাল।

অশোক মিত্র সম্পাদিত —পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, ২য় খণ্ড।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য —বাংলার বাউল ও বাউল গান, ১ম ও ২য় খণ্ড।

কল্যাণী মল্লিক —নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী।

কৃষ্ণচরণ দাস —শ্যামানন্দ প্রকাশ।

কৃত্তিবাস —রামায়ণ, পূর্ণচন্দ্র দে সম্পাদিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ডক্টর সুকুমার সেন-সম্পাদিত (সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৩)।

ঐ —ঐ, মদনগোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত।

ঐ —ঐ, রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত।

ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী —শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশবল্লী।

ক্ষিতিমোহন সেন —বাংলার সাধনা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা সংস্করণ)।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র —কীর্তন (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা সংস্করণ)

গোপীজনবল্লভ দাস —রসিক মঙ্গল।

গোপীনাথ কবিরাজ —শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ।

গৌরগুণানন্দ ঠাকুর —শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব।

জয়ানন্দ —চৈতন্যমঙ্গল

দীনেশচন্দ্র সেন —বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সংস্করণ।

ঐ —বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড।

ঐ —পদাবলী মাধুর্য্য।

নরহরি চক্রবর্তী —ভক্তিরত্নাকর, গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ।

ঐ —নরোত্তমবিলাস, বহরমপুর সংস্করণ।

নবীগোপাল গোস্বামী —বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ। প্রাচ্যবাণী সার্বজনীন গ্রন্থমালা, ৯ম পুষ্প, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ—১৩৫৬

নরোত্তম ঠাকুর —প্রার্থনা।

নিখিলনাথ রায় —মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী
খগেন্দ্রনাথ মিত্র —পদামৃত মাধুরী।

নবদ্বীপ দাস —শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস। গ্রন্থকার কর্তৃক রাধাকুণ্ড হইতে প্রকাশিত।

নগেন্দ্রনাথ বসু —বিশ্বকোষ অভিধান।

নিত্যানন্দ দাস —প্রেমবিলাস, যশোদানন্দ তালুকদারের সংস্করণ।

নীহাররঞ্জন রায় —বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব।

প্রেমদাস —বংশীশিক্ষা, ডক্টর ভাগবতকুমার গোস্বামীর সংস্করণ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় —জ্ঞানভারতী

প্রমথনাথ তর্কভূষণ —বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম (অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, (১৯৩৯)

প্রসন্নকুমার গোস্বামি-সম্পাদিত—অভিরামলীলামৃত।

বৃন্দাবন দাস —শ্রীচৈতন্যভাগবত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত।

বৈষ্ণবদাস —পদকল্পতরু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বিমানবিহারী মজুমদার —শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, (১৯৩৯)

ঐ —গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ঐ —জ্ঞানদাস।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ —ভারত কোষ, ২ খণ্ড।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত —বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজ-তত্ত্ব।

মনোহর দাস —অনুরাগবল্লী, মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত।

মুরারিলাল অধিকারী —বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী।
মণীন্দ্রমোহন বসু —সহজিয়া সাহিত্য।
মালাধর বসু —শ্রীকৃষ্ণবিজয়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত।
যদুনন্দন দাস —কর্ণানন্দ।
রাধাগোবিন্দ নাথ —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা।
ঐ —চৈতন্যচরিতামৃত
রাধামোহন ঠাকুর —পদামৃত সমুদ্র, সংস্কৃত টীকা-সহ রামনারাণ-বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত।
রমেশচন্দ্র মজুমদার —বাংলাদেশের ইতিহাস।
রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ —শ্রীবৈষ্ণব।
রাজ্যেশ্বর মিত্র —প্রাচীন বাঙলার সঙ্গীত।
লালমোহন বিদ্যানিধি —সম্বন্ধ নির্ণয়
লোচন —চৈতন্যমঙ্গল, মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত —শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ।
শহীদুল্লাহ —শূন্য-পুরাণের ভূমিকা।
সুকুমার সেন —বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ।
ঐ — ঐ—অপরার্ধ।
সুশীলকুমার দে —বাংলা প্রবাদ
সুখময় মুখোপাধ্যায় —প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী —হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় —কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ।
ঐ —বৈষ্ণবপদাবলী— সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ (১৯৬১)
হরিদাস দাস —শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য।
ঐ —শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান।
ঐ —শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন ১ম খণ্ড।
হরিলাল চট্টোপাধ্যায় —বৈষ্ণব ইতিহাস
হুতোম প্যাঁচার নক্সা —১ম ভাগ, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কলিকাতা, ১৩৪৪

খ। সংস্কৃত

কবিকর্ণপুর —গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, বহরমপুর সংস্করণ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ —গোবিন্দলীলামৃতম্।
গোপাল ভট্ট —হরিভক্তিবিলাসম্, বহরমপুর সংস্করণ।

চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য —হরিচরিতম্। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত (এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা)।

জীবগোস্বামী —গোপালচম্পূঃ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্করণ।

ঐ —ব্রহ্মসংহিতার টীকা

ঐ —সর্বসংবাদিনী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

ঐ —লোচনরোচনী (উজ্জ্বলনীলমণির টীকা)।

ঐ —দুর্গমসঙ্গমণী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা)।

ঐ —রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা। হরিদাস দাস-সম্পাদিত

বলদেব বিদ্যাভূষণ —গোবিন্দভাষ্যম্। শ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত।

ঐ —কাব্য-কৌস্তভঃ। হরিদাস দাস-সম্পাদিত।

ঐ —সিদ্ধান্তরত্নম্, ১ম-২য় খণ্ড। গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী —আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণির টীকা)।

... —শ্রীমদ্ভাগবতম্।

রসিকানন্দ —শ্যামানন্দশতকম্।

রূপ গোস্বামী —উজ্জ্বলনীলমণিঃ, বহরমপুর সংস্করণ।

ঐ —ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, বহরমপুর সংস্করণ।

ঐ —বিদগ্ধমাধব নাটকম্, বহরমপুর সংস্করণ।

ঐ —ললিতমাধব নাটকম্, বহরমপুর সংস্করণ।

রূপ কবিরাজ —সার সংগ্রহ। ডক্টর কৃষ্ণগোপাল শাস্ত্রী সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

গ। ইংরাজী

Bagchi, Probodh Chandra—"Religion' (History of Bengal, Part I, Chapter XIII, University of Dacca).

Bose, Manindra Mohan —The Post Caitanya Sahajiya Cult of Bengal. (University of Calcutta)

Bhandarkar, R. G. —Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems.

Das Gupta, Sasibhusan —Obscura Religious cults.

De, Susil Kumar —Early History of Vaisnva Faith and Movement.

Do "Sanskrit Literature" (History of Bengal, Part I, Chapter XI, University of Dacca).

—Encyclopaedia Britannica, vol. 13 (University of Chicago, 1947).

Farquhar, J. N. —An Outline of the Religions Literature of India.

Growse, F. S. — Memoir of the Mathura District.

... ... —Imperial Gazetteer of India, Provincial Series-Rajputana.

Kennedy, Melville T. —The Chaitanya Movement.

Mallik, Abhaypada —History of Vishnupur Raj

Majumear, Purnachandra—The Musnud of Murshidabad.

Riseley, H —Tribes and Castes of Bengal.

Roychaudhuri, H. C. —Early History of the Vaisnava Sects.

Sarker, Jadunath —Chaitany's Life and Teachings.

Sastri, Haraprasad —Report on the Search of Sanskrit Mass 1892-1900

Sanskrit College, Calcutta— Our Heritage, II, Part I

Sen, Dinesh Chandra —History of Bengali Literature and Language.

West Bengal District Gazetters —Bankura.

Wilson, H. H. — Sketch of the Religious Sects of the Hindus.

ঘ। সাময়িক পত্রিকা

আনন্দ বাজার পত্রিকা —"পদকর্তা হরিবল্লভ" (প্রবন্ধ)—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৯।

গৌড়ীয় পত্রিকা — রবিবার, ২৯, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪, ইং ১৫।১২।৫৭।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা —ফাল্গুন, ১৩০৬।

ঐ —ভাদ্র, ১৩০৮।

বিশ্বভারতী পত্রিকা —শ্রাবণ—আশ্বিন (১৩০৮) "কর্তাভজার কথা ও গান" (প্রবন্ধ)—সুকুমার সেন।

শব্দ-সূচী

[পা. টী. অর্থে পাদ-টীকা বুঝিতে হইবে]

খ

গ

পরিশিষ্ট

শ্রীনিবাস আচার্যের বংশ তালিকা[১]

১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৭২

গতিগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের বংশতালিকা[১]

১ শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর শ্রীমধুসূদন ঠাকুর ও নৃসিংহনারায়ণের কন্যা তিলসুন্দরী ঠাকুরাণীর বংশীয় শ্রীশশাঙ্কদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।